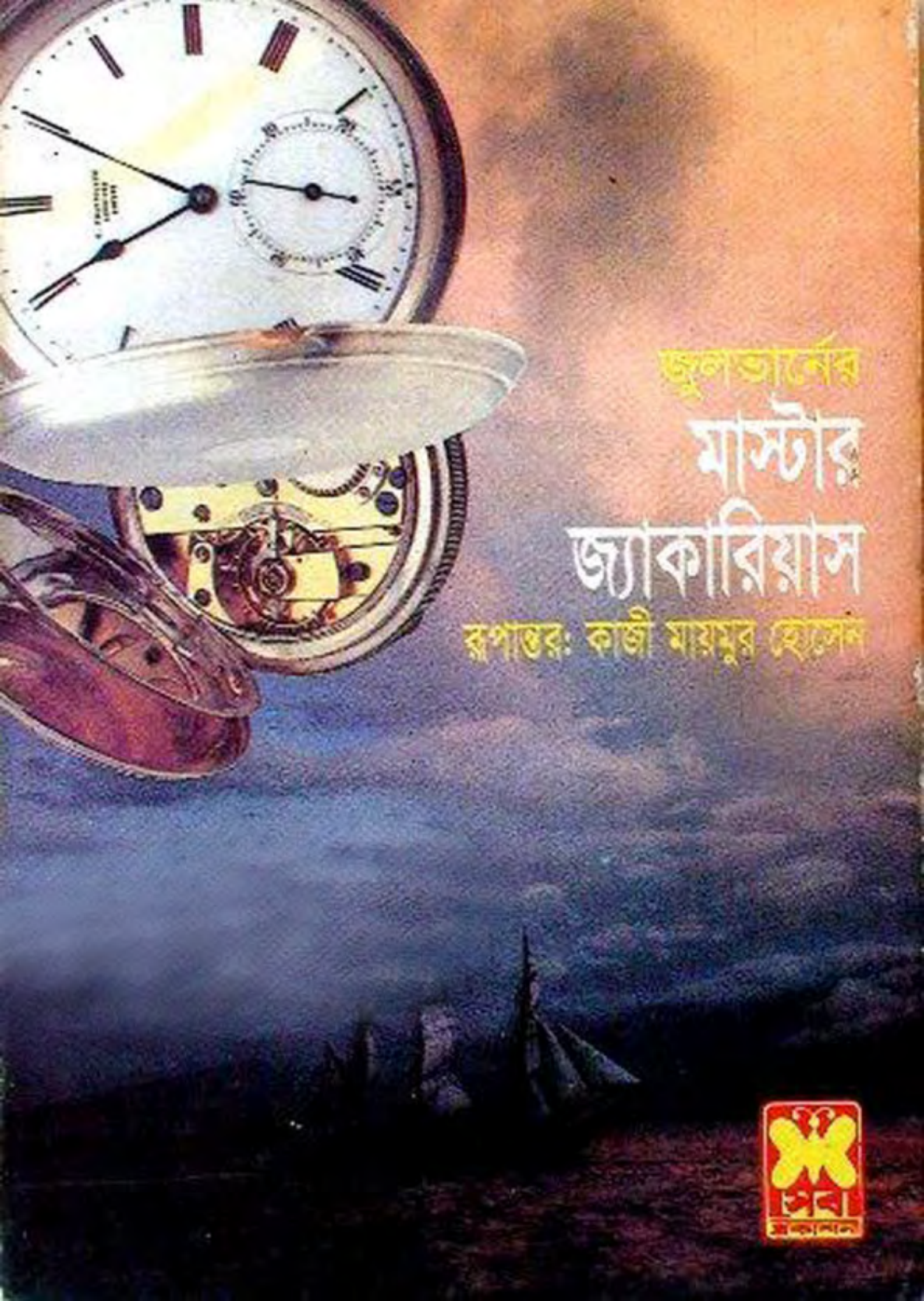

জুলভার্নের

মাস্টার জ্যাকারিয়াস

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

পপ্‌ সকানন

জুল ভার্ন

মাস্টার জ্যাকারিয়াস

রূপান্তর: কাজী মায়মুর হোসেন

ঘড়িতে প্রাণের সঞ্চার করেছেন আশ্চর্য প্রতিভাবান ঘড়ির জাদুকর মাস্টার জ্যাকারিয়াস। এখন একটা একটা করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাঁর তৈরি নিখুঁত ঘড়িগুলো। আস্তে আস্তে প্রাণের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জ্যাকারিয়াসেরও। কি করবেন তিনি? কিভাবে বাঁচবেন?

উনত্রিংশ শতাব্দীর জীবনটা কেমন জানতে চান? চলে আসুন জুলভার্নের সঙ্গে উনত্রিংশ শতাব্দীতে।

কে ওটা, দেখতে বানরের মতো, বিরাট সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে?
জিব্রাল্টার নিয়ে একি খেলা শুরু হলো?

কল্পবিজ্ঞানের পথিকৃত জুলভার্নের এমনি বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ গল্প নিয়ে এই সংকলন।
আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

জুল ভার্নের

মাস্টার জ্যাকারিয়াস

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-3163-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সাতাশ টাকা

MASTAR JAQUARIAS
Jules Verne
By: Qazi Maimur Husain

মাস্টার জ্যাকারিয়াস ৫
জিল ব্রাল্টার ৩২
উনত্রিংশ শতাব্দী ৪৪
ফ্রিৎ ফ্ল্যাক্ ৭০
মিস্টার রে শার্প অ্যান্ড মিস্ মী ফ্ল্যাট ৮৭
ইটারন্যাল অ্যাডাম ১১৬

সেবা প্রকাশনী থেকে
জুল ভার্নের আরও কটি বই

কানপুরের বিভীষিকা, প্রপেলার আইল্যান্ড, লাইট হাউজ, ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড্স্, স্কুল ফর রবিনসন্স ও আ ড্রামা ইন লিভোনিয়া।

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে
ক'টি বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী

কাজী মায়মুর হোসেন

গ্রহান্তরের আগ্রাসন।

কাজী শাহনূর হোসেন

সবুজ মানব, মরা মানুষের শহর, অশুভ পিরামিড, গুহামানবের কবলে, সাগরপিশাচ, মৃত্যু-রোবট, মহাকাশে বন্দী, অন্ধকূপের রহস্য, আঁধারের আততায়ী, কয়লাখনির আতঙ্ক, বন্ধকারখানার রহস্য, জলাভূমির ভয়ঙ্কর, পাতাল বিভীষিকা।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

অশুভ শক্তি।

জুল ভার্ন/শামসুদ্দীন নওয়াব

বেগমের রত্নভাণ্ডার, বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ, রহস্যের দ্বীপ, মাইকেল স্ট্রগফ, নোঙর ছেঁড়া, সাগর তলে, কার্পেথিয়ান দুর্গ, গুপ্ত রহস্য, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, চাঁদে অভিযান, নাইজারের বাঁকে, মরুশহর, মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড, আশি দিনে বিশ্ব ভ্রমণ, পাতাল অভিযান, ব্ল্যাক ডায়মন্ড।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

মাস্টার জ্যাকারিয়াস

এক

রোন নদী।

জেনেভার ঠিক মাঝখান দিয়ে দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে নদীটা। নদীর মাঝে ছোট্ট একটা দ্বীপ। যেন বড়সড় একটা ওলন্দাজ নৌকো।

কতকাল কে জানে, দেখলে মনে হয় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নৌকোটা নদীর মাঝে। দ্বীপে প্রাচীন বাড়িগুলো হেলে পড়েছে নদীর তীরে। রোন নদীর প্রায় মধ্যে থেকেই মাথা তুলেছে সারিসারি থাম আর খিলান।

এ দ্বীপের সবচেয়ে পুরোনো বাড়িটায় থাকেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস। ঘড়ির জাদুকর তিনি। বয়স তাঁর অনেক। কত, তা কেউ জানে না। চুলগুলো বাদ দিলে দেখতে তিনি কালো একটা প্রস্তর মূর্তির মত। পরনে সবসময় কালো পোশাক। মাথার চুলগুলো ধবধবে সাদা। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে হাওয়ায় চুল ওড়ে। কালো পোশাক এদিক ওদিক দোলে। মনে হয় মানুষ নয়, যেন একটা লম্বা ঘড়ি হেঁটে যাচ্ছে। পোশাক যেন ঠিক তার পেণ্ডুলাম।

মাস্টার জ্যাকারিয়াসের মত ঘড়ি নির্মাতা আর একজনও নেই দুনিয়ায়। বিচিত্র বিদঘুটে অবাক করা ঘড়ি তৈরি করে তিনি ভুবন বিখ্যাত।

জ্যাকারিয়াসের বাড়িটাও তার মালিকের মতোই ভাঙাচোরা। মাস্টার নিজে থাকেন নদীর ধারে একটা ঘরে। সে ঘরের তলা দিয়ে বিরামহীন ছুটে চলেছে খরস্রোতা নদী। পাটাতন তুললেই বহমান পানি দেখা যায়। হাতের কাজ ফুরোলেই পাটাতন তুলে নদী দেখেন মাস্টার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নড়েন না। খাবার সময় আর শহরের ঘড়িগুলোয় দম দিতে যাওয়ার সময় ছাড়া ঘরের বাইরেও একদম বেরোন না তিনি।

শোবার ঘরেই তাঁর ঘড়ির কারখানা। ঘরময় ছড়িয়ে আছে অজস্র সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। সব তাঁর নিজের আবিষ্কার। সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হলো, ঘড়ির প্রাণ। এতটা সূক্ষ্ম যন্ত্র তিনি তৈরি করেন যে তিনি নাকি জীবন দেন সব ঘড়িতেই। এ-আবিষ্কার তাঁর একেবারেই নিজস্ব এবং গোপন আবিষ্কার।

বাড়ির সবচাইতে সুন্দর ঘরটায় থাকে মাস্টারের মেয়ে জেরাঁদে। ওর ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় তুষার শুভ্র সফেদ সাদা পাহাড়।

জেরাঁদে মেয়েটা ভাল। মোটেই বাপের মত যান্ত্রিক নয়। ঠিক উল্টো। প্রাণ রসে ভরপুর। মুখখানা এত কোমল, এত মিষ্টি আর এতই সুন্দর যে দশ বিশটা শহর খুঁজলেও ওর সঙ্গে তুলনা দেয়া যায় তেমন কাউকে চোখে পড়বে না। মাত্র আঠারোতে পা দিয়েছে জেরাঁদে।

বিজ্ঞানীর বাড়িতে থাকে আরও দু'জন মানুষ। মাস্টারের সহকারী-শিষ্য অবার্ট, আর চাকর স্কলাস্টিকা।

প্রতি রাতে একসঙ্গে সবাই খেতে বসে দীর্ঘ টেবিলটাতে। কিন্তু একদিন তার ব্যতিক্রম ঘটল। সবার সঙ্গেই মাস্টার খেতে বসলেন, কিন্তু খেলেন না কিছুই। ভালো ভালো খাবার, অথচ চেয়েও দেখলেন না। মেয়ের মধুর অনুরোধ শুনেও না। এমন কি

খাওয়া শেষ হবার পর রোজকার মত মেয়ের কপালে আদর করে চুমুও খেলেন না। হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন কারখানা ঘরের দিকে।

অবাক এবং স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল জেরাঁদে। বাবার কি শরীর খারাপ হয়েছে? কেউ জানে না, কাজেই কারও মুখে কোন কথা নেই। এ-বাড়িতে এমন ঘটনা কখনও ঘটে না। কী এমন অস্বাভাবিক কি ঘটল?

সেরাতে ঝড় উঠল। সন্ধে থেকেই আকাশ মুখ ভার করে ছিল। ঝড় তার তাণ্ডব শুরু করল শোঁ-শোঁ বাতাসে।

স্কলাস্টিকা বলল, 'স্যার যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছেন আজকাল। ভূতের আসর কিনা কে জানে! ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'উদ্বেগে ওরকম করছেন,' বলল জেরাঁদে। 'কিন্তু কেন এত উদ্বেগ, সেটা বুঝতে পারছি না।'

'আমি জানি, জেরাঁদে,' মৃদু কণ্ঠে বলল অবার্ট।

'জানো? তাহলে আমাদের বলোনি কেন?'

'কিছুদিন ধরে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটছে। মাস্টারের তৈরি ভাল ভাল ঘড়িগুলো একে একে সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফেরৎ আসছে মেরামতের জন্যে। মাস্টার কলকব্জা খুলে ফেলেও গোলমাল কোথায় সেটা ধরতে পারছেন না। সব ঠিক আছে, অথচ ঘড়ি আর চলছে না।'

স্কলাস্টিকার মুখ চলে বেশি। সে বলে উঠল, 'হবেই তো। তামা-পেতলের ঘড়ি আবার কোন কালে ভাল হয়েছে। এর চাইতে ঢের ভাল ছিল বাপু সেকালের ছায়া ঘড়ি। দম দিয়ে কি ঘড়ি চালু রাখা যায়?'

ওর কথায় কান না দিয়ে জেরাঁদে বলল, 'এসো, আমরা স্রষ্টার

কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন বাবার ঘড়িগুলোকে আবার আগের মতো করে দেন।'

প্রস্তাবটা সবারই পছন্দ হলো।

মোমবাতি জ্বালানো হলো। তিনজন হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করল ঈশ্বরের উদ্দেশে। তারপর শুতে গেল যে যার ঘরে।

জেরাঁদের চোখে ঘুম এলো না। বাবার উদ্বেগ সংক্রমিত হয়েছে তার মধ্যে। ব্যাপারটা সত্যি আশ্চর্য। যাঁর ঘড়ি, তিনিও ঘড়ির দোষ ধরতে পারছেন না?

ঝড় বেড়েছে। দামাল হাওয়ায় নড়বড়ে দরজা-জানালাগুলো ককাচ্ছে। মুষলধারে বৃষ্টিতে রোন নদী যেন ফুঁসে উঠে পুরোনো বাড়িটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে আর্তনাদ করছে আলগা পাটাতনগুলো।

ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে হঠাৎ একটা হাহাকার ধ্বনি শুনতে পেল জেরাঁদে। কে যেন বুক ফাটা কষ্টে বিলাপ করছে!

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চমকে উঠল জেরাঁদে। রাত এখন গভীর, অথচ বাবার ঘরে আলো জ্বলছে কেন!

আরও চিন্তিত না হয়ে পারল না জেরাঁদে। বাবার কারখানার সামনে গিয়ে দেখল ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে মাস্টার জ্যাকারিয়াস।

নড়বড়ে বাড়ি, বৈজ্ঞানিকের ঘরটা ঝড়ের দাপটে কাঁপছে, দুলছে, যেন উড়ে যাবে এক্ষুণি। নদীস্রোত সগর্জনে আছড়ে পড়ছে নিচের ভিতে। উন্মত্ত বাতাসে চুল উড়ছে মাস্টারের। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে তাঁকে দেখতে। যেন শরীরী পিশাচ। পাগল প্রকৃতির এই ঝড়ো রাতে উন্মাদের মত প্রলাপ বকছেন আপন মনে ঘড়ির জাদুকর মাস্টার জ্যাকারিয়াস।

'আর কি থাকল আমার জীবনে? আমার প্রাণটাই তো দান

করেছিলাম ঘড়িগুলোর মধ্যে। আমার প্রাণের অংশ বিলিয়ে দিয়েই তো ওদের মাঝে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। রুপো, লোহা, সোনা, তামা, পেতলের কলকব্জার মধ্যে আমি, মাস্টার জ্যাকারিয়াসই তো সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করেছি। আমি ওদের স্রষ্টা, ওদের জীবনদাতা। আত্মার অংশ নিয়েই তো ওরা সচল ছিল এতদিন। কিন্তু আজ যদি ওরা থেমে যায় একে একে, তাহলে তো আমার প্রাণও থেমে যাবে একদিন। আমি, মাস্টার জ্যাকারিয়াস, তাহলে কি এভাবেই মরে যাব শুধু ওই ঘড়িগুলো থেমে যাওয়ায়?'

পাগলের মত বকবক করতে করতে টেবিলের জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে লম্বা একটা নলের ভেতর দিয়ে উল্টেপালটে দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলেন ঘড়ির অংশগুলো। স্ক্রু খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলেন। সাপের কুণ্ডলীর মত স্প্রিং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নদীর পানিতে নিক্ষেপ করছিলেন। সব আছে, সব আছে। নেই কেবল প্রাণের স্পন্দন।

অথচ এই প্রাণটাই ধার দিয়েছিলেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস। আজ তা উধাও।

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জেরাঁদে। এ কী শুনছে সে? পাগলের প্রলাপ, না, আসলেই এ সত্য? সত্যিই কি আপন আত্মা দিয়ে ঘড়ি সৃষ্টি করেছিলেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস? তা-ও কি সম্ভব? অসম্ভব হলে বাবা এমন হাহাকার করছেন কেন?

চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল জেরাঁদে, এমন সময়ে কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল অবার্ট, 'জেরাঁদে, রাত অনেক হয়েছে। ঘরে যাও।'

আতঙ্কিতা জেরাঁদে বলল, 'অবার্ট, বাবা কি ঈশ্বরের চোখে অপরাধী? নিজের আত্মা ঘড়িদের মধ্যে সঞ্চার করেছেন সেটা কি ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা?'

'জানি না। চলো, শোবে চলো।'

ঘরে ফিরে এল জেরাঁদে। মাস্টার সারারাত পাটাতন তুলে হেঁট হয়ে দেখলেন পাগলা নদীর ক্ষ্যাপামি।

দুই

জেনেভার ব্যবসায়ীরা সৎ। তারা লোক ঠকায় না। লোক ঠকানো তাদের ধাতেই নেই। দারুণ সুনাম তাদের এ ব্যাপারে। সেই সুনামের ওপর মারাত্মক কুপ্রভাব পড়ল মাস্টার জ্যাকারিয়াসের ঘড়ি বিকল হতে শুরু হওয়ার পর। মাথা হেঁট হয়ে গেল মাস্টারের। সেই সঙ্গে জেনেভার ব্যবসায়ীদের।

এতদিন লোকে কানাঘুসো করত, মাস্টার নাকি পিশাচসিদ্ধ পুরুষ। ডাইনীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। সেকারণেই মরা ধাতুকেও জ্যান্ত করতে পারেন। ঘড়ির মধ্যে হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দিতে পারেন।

সেই ঘড়িগুলোই আচমকা বন্ধ হতে লাগল। কানাঘুসো এবার আর কানাঘুসো থাকল না। মানুষ সামনেই মুখ খুলতে শুরু করল। লোকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল মাস্টারকে। যা রটে, তার কিছু তো বটে। সত্যিই কি মাস্টার পিশাচসিদ্ধ? নইলে ঘড়িগুলো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন? কলকব্জা তো সবই ঠিকঠাক। তাহলে? কি এর ব্যাখ্যা!

সারারাত এসব ভেবে মাথা গরম হয়ে গেল বেচারা জেরাঁদের। ঘুমোতে পারল না। কি করবে কিছু ঠিকও করতে পারল না।

মাস্টারও ঘুমোতে পারেননি। ভোরের হাওয়ায় মাথাটা একটু

ঠাণ্ডা হলো। অবার্ট এলো কারখানায়। শুরু হলো দু'জনের কথা কাটাকাটি।

অবার্ট সোজা বলে দিল, মাস্টার জ্যাকারিয়াসের ভীষণ গর্ব হয়েছে। বিজ্ঞান নিয়ে এত দম্ভ ভাল নয়।

খেপে গেলেন বুড়ো জ্যকারিয়াস। 'গর্ব করব না? আমি কি শুধু ঘড়ির মিস্ত্রী? না, আমি ঘড়ির প্রাণদাতা। তুমিও কি আমার হাতের একটা যন্ত্র নও? আমার ইচ্ছাতেই তুমি ঘড়ি তৈরি করো না?'

'তা করি। কিন্তু আপনিও স্বীকার করেছেন ঘড়ির সূক্ষ্ম কলকব্জা জোড়ার হাত আমার খুবই ভাল।'

'কিন্তু প্রাণ তো দিতে পারো না। লোহা, তামা, পেতল, সোনার মধ্যে তোমার প্রাণ তো বিলিয়ে দাও না। তাই ঘড়িরা মরলে তুমি মরবে না। কিন্তু আমি মরব।'

জ্যাকারিয়াস চটে গেছেন দেখে তোশামোদ শুরু করল বুদ্ধিমান অবার্ট। বলল, 'আপনার হাতের কাজ দেখে কিন্তু খালি দেখতেই ইচ্ছে করে। আমার কোয়ার্জ ঘড়ি নিয়ে আপনার গবেষণা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসে।'

কথা শুনে এতক্ষণে একটু খুশি হলেন বুড়ো। 'তা যা বলেছ। কোয়ার্জকে কেটে হীরের আকার দেয়ার বিদ্যে তো আমিই শেখাব তোমাকে।'

সম্প্রতি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছেন মাস্টার এ-ব্যাপারে। কোয়ার্জ কেটে বানিয়েছেন অতি সূক্ষ্ম অতি জটিল যন্ত্রপাতি। ঘড়ির চাকা, কীলক, সব কোয়ার্জ থেকে তৈরি। এ ঘড়ি নিখুঁত সময় দেবে। বার বার দেখেও আশ মিটবে না। স্বচ্ছ আধারের মধ্যে স্বচ্ছ কলকব্জা চলবে অবিকল হৃৎপিণ্ডের মত। সত্যি এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার! সত্যিই আশ্চর্য!

বিষণ্ণ গলায় বললেন মাস্টার, 'বার্ট, আমি জানি তোমরা আমাকে পাগল ভাবো। আমাকে বোকা মনে করো। কিন্তু বিশ্বাস করো, প্রাণ কি জিনিস আমি তা আবিষ্কার করেছি। দেহ আর আত্মার মধ্যেকার জটিল যোগসূত্র ধরে ফেলেছি।'

বলতে বলতে আবার দম্ভ ভর করল মাস্টারের চোখে মুখে। জ্বলে উঠল চোখের দৃষ্টি।

এ দম্ভ তাঁকে মানায়। মাস্টার যখন শিশু, ঘড়িশিল্প তখন প্রথম অবস্থায় বললেই চলে। ঘড়ির যন্ত্রের সৌন্দর্যের দিকেই নজর দেয়া হত বেশি। সে যুগের ঘড়িগুলো সময় ঠিক মতো দিতে না পারলেও চেহারা দেখলে মুগ্ধ হতে হতো। তামা, কাঠ, সোনা এবং রুপো দিয়ে খোদাই করে তৈরি হতো এক একটা ঘড়ি। ওগুলো শিল্প-নিদর্শন হিসাবে অতুলনীয়, কিন্তু নিখুঁত সময় দেয়া ঘড়ি হিসেবে নয়। তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাত না। মানুষ সে যুগে বাঁচতে জানত। দুশো বছরে একটা মঠ তৈরি করত, সারা জীবনে একটা মহাকাব্য রচনা করত, খান কয়েক ছবি আঁকত। ঘড়ি ধরা সময়ের মধ্যে কাজ করে নিজেরাই যন্ত্র হতে শেখেনি মানুষ তখনও।

এখন যুগ পাল্টেছে। বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। মাস্টার জ্যাকারিয়াস পেণ্ডুলামের মধ্যে এমন একটা কৌশল আবিষ্কার করেছেন যে নিখুঁত সময় দেয় তাঁর তৈরি প্রতিটি ঘড়ি। গতি নিয়ন্ত্রণ করার মূল রহস্যটাই উনি ধরে ফেলেছেন। নির্ভুল ঘড়ি বানাতে বানাতে একদিন নিজেকে তিনি স্বয়ং স্রষ্টা মনে করে বসলেন। ভাবলেন, প্রাণের রহস্য ধরে ফেলেছেন। দেহ আর আত্মার মিলন ঘটছে ঠিক কোন জায়গায়, তা আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

অবার্টকেও তাই বলেছেন। বলেছেন, 'প্রাণ কী? কতগুলো-

স্প্রিংয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কি। আমার নিজের দেহটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেই প্রাণতত্ত্ব আবিষ্কার করেছি আমি। দেহ ভাল চললেই প্রাণটা ঠিক থাকে। প্রাণের কাজ শুধু দেহটাকে ভালভাবে চালানো, মানে নিয়ন্ত্রণ করা। শাসন করা। অনেক ভেবে দেখলাম, ঘড়ির কলকব্জা নিয়ন্ত্রণ করার মত একটা চাকা যদি আবিষ্কার করি, তাহলেই ঘড়ি চলবে নিখুঁতভাবে। আমি তাকেই বলছি ঘড়ির আত্মা। ওটা আমার আবিষ্কার, ধরে নিতে পারো আমারই আত্মার কণা।'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন মাস্টার, 'মানুষের দেহের মধ্যেও দুটো শক্তি কাজ করছে। দেহের আর আত্মার। দেহের গতি আর আত্মার নিয়ন্ত্রণ, এই হলো আমাদের প্রাণ। অর্থাৎ প্রাণ হলো আসলে এদুটোর মিশ্রণ। নিখুঁত, নির্ভুল, স্বয়ংক্রিয় এক অপূর্ব যন্ত্র।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জেরাঁদে শুনছিল বাবার অদ্ভুত কথা। এখন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বুকে। কান্না ভেজা স্বরে বলল, 'বাবা, আমার বুকে যদি হৃৎপিণ্ডের বদলে একটা স্প্রিং থাকত, তাহলে কি তোমাকে আমি এমন করে ভালবাসতে পারতাম?'

সহসা ককিয়ে উঠলেন মাস্টার। ঘরে ঢুকল স্কলাস্টিকা।

কাৎরাতে কাৎরাতে বললেন মাস্টার, 'আর একটা ঘড়ি খারাপ হলো, তাই না?'

অবাক হলো স্কলাস্টিকা। একটা বিকল ঘড়ি এগিয়ে দিল। অবাক গলায় বলল, 'আপনি জানলেন কি করে?'

'আমার হৃৎপিণ্ড কখনও ভুল করে না।'

অবার্ট দম দিল ঘড়িতে, যদি আবার চালু হয়। কিন্তু ঘড়ি আর চলল না।

তিন

ডাক্তার এলো, কিন্তু কিছুতেই সুস্থ করা গেল না মাস্টারকে। জেনেভার ঘড়ির নির্মাতারা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হলো মাস্টারের অদ্ভুত অসুখের কথা শুনে। একে একে তাঁর তৈরি ঘড়িগুলো বিগড়ে যাচ্ছে, মাস্টারও ভেঙে পড়ছেন। বুকের খাঁচায় তাঁর হৃৎপিণ্ডটাও যেন দুর্বল হয়ে আসছে, ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে একেবারেই থেমে যাচ্ছে, তারপর ধড়ফড় করে উঠছে। চলছে আবার বেতালা ছন্দে। এ কোন্ রোগ! ডাক্তাররাও হাল ছেড়ে দিলেন।

মাস্টার নিজেও যেন আস্তে আস্তে কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। মানুষ হয়েও যেন অমানুষ হয়ে যাচ্ছেন। যেন মনটা রয়েছে অন্য দুনিয়ায় আর দেহটা পৃথিবীতে।

তবে কি সবই সত্যি? সত্যিই কি তিনি সাক্ষাৎ শয়তান? পুরোনো গুজবটা ফের শুরু হয়ে গেল শহরময়। আতঙ্ক দেখা দিল ঘরে ঘরে। গড়ে উঠল চাপা অসন্তোষ।

প্রাণপণে সেবা করছে জেরাঁদে আর অবার্ট। মেয়ের হাত ধরে সকাল সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে একটু একটু করে নিজের ওপর আস্থা ফিরে এল মাস্টারের। নিজেকে বড় একা নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। এখন মনে হলো, নিজের এমন সুন্দরী ভাল একটা মেয়ে থাকতে তিনি একা হতে যাবেন কোন্ দুঃখে?

ঠিক করলেন, একটু সেরে উঠলেই অবার্টকে জামাই করে নেবেন। কথাটা অবশ্য কাউকে বললেন না।

শহরময় অবশ্য কানাঘুসো আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সহকারীর সঙ্গে নাকি মেয়ের বিয়ে দেবেন মাস্টার। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বাজার-হাটে দোকানে-মাঠে যেখানেই কথা উঠছে, দেখা যাচ্ছে একটা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিকে। লোকটাকে এর আগে কখনও শহরে দেখা যায়নি। মুখখানা ঘড়ির ডায়ালের মত, ধড়টা চৌকো, ঘড়ির আধারের মত। হাত নাড়ে ঘড়ির কাঁটার মত। কান পাতলে শোনা যায় পেণ্ডুলাম দুলছে টিকটিক করে বুকের মধ্যে। হাঁ করলে মনে হয় যেন খাঁজ-খাঁজ দাঁতের ফাঁক দিয়ে চাকা ঘুরছে মুখের মধ্যে। পিছু নিলে দেখা যায়, ঘণ্টায় ঠিক এক লীগ পথ হাঁটে তিন ফুট উঁচু কদাকার বামণটা, হাঁটে বৃত্তাকার পথে এবং দুপুর বারোটার ঘণ্টা বাজার সময়ে হাজির থাকে গির্জার সামনে।

কুৎসিত এই অদ্ভুত লোকটাকে দেখা যাচ্ছে সব জায়গায়। যেখানে জেরাঁদে আর অবার্টের আসন্ন বিয়ের কথা, সেখানেই সে। শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, তার টিটকারি দেয়াও চাই। খুক খুক করে হেসে ঘড়ির ঘণ্টার মত যান্ত্রিক আওয়াজে সে বলে, 'ও বিয়ে হবে না!'

বাবাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে জেরাঁদেও দেখেছে অদ্ভুত মূর্তিটাকে। ভীষণ অস্বস্তি লেগেছে ওর। লোকটা একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। চোখাচোখি হলেই মুচকি মুচকি হাসে।

একদিন শিউরে উঠে বাবাকে জড়িয়ে ধরল জেরাঁদে।

'কি হয়েছে, মা?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন মাস্টার।

'দেখো বাবা, ওই লোকটা কিরকম ভাবে যেন দেখছে আমাকে।'

তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন মাস্টার। হেসে বললেন, 'ঘাবড়িয়ো না। ঠিকই চলছে। ওটা একটা ঘড়ি। এখন চারটে বাজে।'

হতভম্ব হয়ে গেল জেরাঁদে। মাস্টার জ্যাকারিয়াস মানুষ না

আর কিছু? মানুষের মুখে ঘড়ির কাঁটা দেখলেন কি করে?

বাড়ি ফিরে এলেন মাস্টার। অনেকদিন পরে সটান গেলেন কারখানা ঘরে। থম মেরে বসে রইলেন দরজা বন্ধ করে দিয়ে।

তখন পাঁচটা বাজে। একেকটা ঘড়িতে এক এক সময়ে পাঁচটা বাজছে। আগে এমন হত না। ঠিক পাঁচটার সময়ে সব কটা ঘড়ি একসঙ্গে ঢং-ঢং করে বেজে উঠত।

পনেরো মিনিট ধরে বিভিন্ন ঘড়ির বেতালা ঘণ্টাধ্বনি শুনে আরও চঞ্চল হলেন মাস্টার। ঠিক তখনি কে যেন ঘুসি মারল দরজায়।

দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল সেই কদাকার বামণটা, চেহারা যার ঘড়ির মত।

ঢুকেই বলল, 'আমি আপনার সেবা করতে এসেছি। সূর্যকে শাসন করাই আমার কাজ। আপনার বেয়াড়া ঘড়িগুলোকেও শায়েস্তা করতে পারব আমি।'

কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকলেন মাস্টার, তারপর কাতর স্বরে বললেন, 'তদ্দিন কি আমি বেঁচে থাকব?'

লাফ দিয়ে একটা উঁচু চেয়ারে উঠে পা তুলে বসল বামণ বিভীষিকা। খনখন করে বিশ্রী হেসে ধাতব স্বরে বলল, 'কেন বাঁচবেন না?'

চেয়ে থাকতে থাকতে মাস্টারের মনের মধ্যে হঠাৎ করে বামণের কথাটা গভীর প্রভাব ফেলল। দুষ্ট চিন্তা এলো মগজে। তিনি প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'সত্যিই তো! ঠিক! কেন বাঁচব না? আমি মাস্টার জ্যাকারিয়াস! আমার মৃত্যু নেই। আমি আত্মা দিয়ে ঘড়ি বানিয়েছি। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড সৃষ্টি করেছি। অসীম মহাকালকে সীমার মধ্যে বেঁধেছি। এই মহাবিশ্ব যিনি তৈরি করেছেন, আমি তাঁরই মত মৃত্যুহীন। আমি তাঁরই সমান।'

'স্বয়ং শয়তানও স্রষ্টার সঙ্গে এভাবে নিজেকে তুলনা করেনি মাস্টার,' বলল বামণ, 'এই জন্যেই তো আমি এসেছি বিদ্রোহী ঘড়িগুলোকে বশ করার পথ বাৎলাতে।'

'বলো কি সেই পথ।' উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করলেন মাস্টার।

'তার আগে আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।'

'জেরাঁদের সঙ্গে বিয়ে? অসম্ভব! তার বিয়ে অবার্টের সঙ্গে হবে।'

'অসম্ভব! অবার্টের সঙ্গে জেরাঁদের বিয়ে কোন কালেই হবে না। আপনার রোগও সারবে না। ঘড়িরাও ভাল হবে না। আপনি মরবেন। এই যদি আপনার বক্তব্য হয় তাহলে আমি চললাম।'

একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল বিটকেলে বামণটা। মাস্টার জ্যাকারিয়াস কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেলেন, ঢং-ঢং করে ছটা বাজল তার বুকের মধ্যে!

চার

মারাত্মক রকমের খেপে গেলেন মাস্টার। জেদ চেপে গেল। ঘড়িগুলো সারিয়ে তুলতেই হবে। বাঁচতেই হবে। অবার্টের সঙ্গে জেরাঁদের বিয়ে দিতেই হবে। দিন রাত মনে পড়ছে বিকট বামণের কর্কশ কথাটা, 'অবার্টের সঙ্গে জেরাঁদের বিয়ে কোনকালেই হবে না।' যতবার মনে পড়ছে ততবারই দ্বিগুণ উৎসাহে ঘড়ি মেরামতের কাজে লেগে পড়ছেন তিনি। চাকা পরীক্ষা করছেন, কী-লকগুলো ঠিকঠাক বাজছে কিনা বাজিয়ে দেখছেন। ডাক্তার যেভাবে রুগীর চুল থেকে নখ পর্যন্ত দেখে, ওই

ভাবেই দেখছেন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিন্তু কিছুতেই আবিষ্কার করা গেল না, কেন খামোকা একে একে থেমে যাচ্ছে ঘড়িগুলো।

দম্ভ কিন্তু কমল না। বেড়েই চলল। শয়তান বামণ সেই অপকর্মটি করে রেখে গিয়েছে। মাস্টারের দম্ভকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। বোকার মতো নিজেকে তিনি এখন স্রষ্টার সমান মনে করছেন।

তাঁর মধ্যে পাগলামির ভাব বাড়ল। ঘড়ি খারাপের খবর পেলেই ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন বাড়ি থেকে। শহরের যেখানেই ঘড়ি থেমে থাকুক না কেন, মাস্টার হাজির হচ্ছেন সেখানে। প্রাণপণে দম দিচ্ছেন। কিন্তু পেণ্ডুলাম আর দুলছে না।

তাঁর সঙ্গে অবার্ট আর জেরাঁদেও যাচ্ছে, পাছে কখন কি করে বসেন! কিন্তু সবই বৃথা। ফিরে আসতে হচ্ছে ওদের মুখ কালো করে। কিন্তু হাল ছাড়ছেন না জ্যাকারিয়াস, যেন জ্বরের ঘোরে বন্ধ ঘড়িগুলোর পেছনে অযথা সময় দিচ্ছেন। সব পণ্ডশ্রম।

অবার্ট অবশ্য সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বার বার বলছে, 'অনেকদিন চললে কলকব্জা ক্ষয়ে যায়। হয়তো চাকার দাঁত ক্ষয়ে গেছে, কীলক ঘাটে বসছে না।'

এসব শুনলে খেঁকিয়ে ওঠেন মাস্টার, 'বাজে কথা বোলো না। তামার পাতগুলো আমার নিজের হাতে কাটা। নিজের হাতে আগুনে গলিয়ে আমি তৈরি করেছি প্রত্যেকটা তামার টুকরো। স্প্রিংগুলোও সাধারণ স্প্রিং নয় যে ক্ষয়ে যাবে। একটা কিছু বললেই হলো? নিশ্চয় ভূত ঢুকে বসে আছে ঘড়ির মধ্যে।'

ক্রমেই বাড়িতে টেকা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল নষ্ট ঘড়ির মালিকদের উৎপাতে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তারা বন্ধ ঘড়ি ফেরৎ দিয়ে যাচ্ছে। শক্ত শক্ত কথা শুনিয়ে যাচ্ছে মাস্টারকে।

আর কত সহ্য করা যায়। অতিষ্ঠ অস্থির হয়ে শেষকালে তাঁর

সিন্দুক খুললেন মাস্টার। সারাজীবনের জমানো সোনার মোহর দিয়ে কিনে নিতে লাগলেন বন্ধ ঘড়িগুলো। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল তাঁর জমানো মোহর। এবার গৃহস্থালি জিনিসও বেচতে লাগলেন মাস্টার। বাসন-কোসন, থালা-বাটি কিছুই বাদ যাচ্ছে না। তারপর বেচা শুরু হলো দামি দামি ফ্লেমিশ ছবি। শেষ পর্যন্ত নিতান্ত বাধ্য হয়ে নিজের তৈরি অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পর্যন্ত বেচে দিলেন পানির দরে। তাতেও যখন ঋণ শোধ হয় না তখন অবার্ট নিজের টাকা দিয়ে দিল মাস্টারের হাতে।

স্কলাস্টিকা কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীর কাছে গর্ব করে বেড়াত মাস্টারের আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে। তার সামনে চাকরিদাতার বদনাম করলে এখনও তেড়ে উঠে সাত কথা শুনিয়ে দেয়। বলে, 'কে বলল সব ঘড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছে? মনে আছে সেই ঘড়িটার কথা? লোহার ঘড়ি। এত দামী যে জেনেভার লোকের কেনার টাকা হয়নি। যিনি কিনেছেন তাঁর বাগান বাড়িতে গেলে এখনও ওটা দেখা যায়, চলছে ঠিকই।'

'জানি, জানি শয়তানের সঙ্গে যোগসাজস করে বানিয়েছিলেন তো?' টিপ্পনী কাটল একজন।

অমনি ফুঁসে উঠল স্কলাস্টিকা, 'তাই বুঝি সে ঘড়ি থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নীতিবাক্য বেরিয়ে আসে? স্রষ্টার বাণী, শুনলে যে কোন ধার্মিক মৃত্যুর পর সোজা স্বর্গে পৌঁছে যাবে।'

কথাটা সত্যি। জ্যাকারিয়াসের সেরা কীর্তি হলো আশ্চর্য এই লোহার ঘড়িটা। কুড়ি বছর আগে বানিয়েছিলেন। আজও তা চলছে। আপনা আপনিই চলে। কাউকে দেখাশুনা করতে হয় না!

এদিকে মনে মনে ক্রমশ ভেঙে পড়ছেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন তো অবার্টের সঙ্গে?

ইদানিং ধর্মকর্মও ছেড়ে দিয়েছেন। আগে নিয়মিত গির্জায় যেতেন। আজকাল যান না, অস্বস্তি লাগে। শয়তান যেন ক্রমশই তাঁর কাছে আসছে, দূরে সরে যাচ্ছেন স্রষ্টা।

জেরাঁদে অনেক করে বুঝিয়ে একদিন তাঁকে গির্জায় যেতে রাজি করাল। ঠিক হলো সামনের রবিবার মেয়ের সঙ্গে প্রার্থনা করতে যাবেন মাস্টার।

এলো সেই বহু প্রতীক্ষিত রোববার। বাবার হাত ধরে গির্জায় গেল জেরাঁদে। কিন্তু জ্যাকারিয়াস যেন কালো শয়তানের প্রতিকৃতি। এক কোণে বসলেন তিনি। দেখেই ভয়ে দূরে সরে গেল গির্জার ধর্মপ্রাণ লোকজন।

শুরু হলো স্তবগান। স্রষ্টার মহিমা কীর্তন। সবাই অবনত মস্তকে ভক্তি ভরে শুনল সেই গান। মাস্টার ছাড়া। ঔদ্ধত্বের সঙ্গে মাথা তুলে রইলেন তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তাঁর মনোভাব বদলায়নি। তিনি এখনও ভাবেন, ঈশ্বরের চাইতে তিনি কম কিসে?

একেই বলে শয়তানে পাওয়া!

গির্জার প্রকাণ্ড ঘড়িটার বারোটা সংখ্যা যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। বারো চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরছে গর্বে মত্ত মানুষটার ওপর। তোয়াক্কা করলেন না মাস্টার!

ঠিক বারোটার সময়ে দেবদূতের জয়গান করা হয়। গির্জার রীতি তাই। তারপর শেষ হয় প্রার্থনা সভা।

সেদিনও সবাই দাঁড়িয়ে আছে দুপুর বারোটা বাজার অপেক্ষায়। ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগোচ্ছে বারোটার ঘরে। হলঘর নিস্তব্ধ।

আচমকা নৈঃশব্দ্য খানখান হয়ে গেল মাস্টার জ্যাকারিয়াসের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে। বুক খামচে ধরে ঢলে পড়লেন তিনি।

ঘড়ির কাঁটা দাঁড়িয়ে গেছে। বারোটা কোন দিনই আর বাজবে না।

যেন আজ মরণ ঘটেছে মাস্টারের। ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন। পাঁজাকোলা করে তাঁকে বয়ে নিয়ে এলো সবাই। জ্ঞান রইল না অনেকক্ষণ।

কিন্তু স্বভাব যায় না মরলে। সবাইকে আশ্চর্য করে দিলেন তিনি। জ্ঞান ফিরে আসার পরেই চেঁচিয়ে উঠলেন প্রাণপণে, 'আমি জ্যাকারিয়াস! আমার মৃত্যু নেই! কে বলল আমি মরব? খাতা কোথায়? কোথায় আমার হিসেবের খাতা?'

নিজেই লাফিয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে। বের করলেন হিসেবের খাতা। এই খাতাতেই লেখা থাকে তাঁর ঘড়ি বিক্রির হিসেব। ক্রেতাদের নাম ঠিকানা।

দেখা গেল, সব ঘড়িই ফিরে এসেছে, একটা ছাড়া।

সেই লোহার ঘড়িটা?

তার মানে ঘড়িটা এখনও চলছে। এখনও বন্ধ হয়নি।

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টার, 'আমি যাব!! আমি যাব! আমি যাব! খুঁজে বের করব ওই ঘড়ি! কিছুতেই বন্ধ হতে দেব না লোহার ঘড়িকে। আমার প্রাণ ভোমরা যে এখনও ধুক ধুক করছে ওই ঘড়ির মধ্যে! ওকে বাঁচিয়ে রাখলেই আমি বেঁচে থাকব! অমর হব! মৃত্যুহীন হব!'

বলতে বলতে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন মাস্টার।

পাঁচ

এরপর হঠাৎ যেন অমানুষিক শক্তি ভর করল মাস্টারের ওপর।

যিনি মরতে বসেছিলেন, তিনি হঠাৎ কারখানা নিয়ে ফের মেতে উঠলেন। কয়েক দিন পেরিয়ে গেল এভাবে। তারপর একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস!

জেরাঁদে এসে তাঁকে কারখানায় দেখতে পেল না। সারা জেনেভা শহর খুঁজেও তাঁর ছায়া দেখা গেল না।

অবার্ট বলল, 'নিশ্চয় উনি সেই লোহার ঘড়ির সন্ধানে গেছেন। ওঁর প্রাণ ভোমরা যে এখনও ওই ঘড়ির খাঁচায়।'

তক্ষুনি হিসেবের খাতা খোলা হলো। দেখা হলো, লোহার ঘড়িটা রয়েছে আঁদেরনাতের বাগানে, সুইজারল্যান্ডের সীমান্তে, জেনেভা থেকে বিশ ঘণ্টার পথ।

এই ঘড়িটার কথাতেই গর্ব করত বুড়ি স্কলাস্টিকা পাড়া প্রতিবেশীর কাছে। ওটাই মাস্টারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল তিনজন; বুড়ি স্কলাস্টিকা, জেরাঁদে আর অবার্ট। পাহাড় পর্বত মাঠ বন নদী প্রান্তর পেরিয়ে হেঁটে চলল ওরা। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইলেও বিশ্রাম নিল না।

রাত হলো। অবসাদে মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছোল ওরা একটা মঠে। যাজকের সামনে বসে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল জেরাঁদে।

বাইরে তখন বরফ পড়ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বেলেছেন যাজক। আগুনের আঁচে বসে শুনলেন তিনি মাস্টার জ্যাকারিয়াসের আকাশচুম্বী দম্ভের কাহিনী। অধর্মের কাহিনী।

বললেন, 'গর্বই তো মানুষের সর্বনাশ করেছে। ফেরেস্তারও ক্ষতি করেছে। গর্বের চাইতে ভয়ানক শত্রু পৃথিবীতে আর নেই। অহঙ্কারের চাইতে বড় অধর্ম আর কিছু হতে পারে না!'

আচমকা ঘেউ ঘেউ করে একটা কুকুর ডেকে উঠল বাইরে।

সেই সঙ্গে দমাদম ধাক্কা পড়ল দরজায়।

শোনা গেল তারস্বরে চীৎকার, 'শয়তানের নামে বলছি। খোলো দরজা!'

ধাক্কার জোরে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দমকা হাওয়ার মতো ঘরে প্রবেশ করল এক লোক।

মাস্টার জ্যাকারিয়াস!

'বাবা! বাবা! ফিরে চলো আমাদের সঙ্গে।' উদভ্রান্ত মানুষটাকে চিনতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ল জেরাঁদে।

'কেন? কেন ফিরে যাব? যেখানে আমার প্রাণ নেই, সেখানে আমি নেই। আমি সেখানে মৃত। আমার জীবন সামনে, আঁদেরনাতের দুর্গে!'

'বাবা! বাবা!'

'না! খবরদার! আমাকে বাধা দিতে এসো না।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। 'এখানে কেন এসেছ তোমরা? বিয়ে করতে? বেশ তো, করো, করে ফেলো বিয়ে। সুখী হও, আমাকে যেতে দাও। আমি আমার আত্মার কাছে যাব!'

'আত্মার মৃত্যু নেই, মাস্টার জ্যাকারিয়াস,' বললেন যাজক।

'মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প?' পাগলের মতো হাসলেন জ্যাকারিয়াস। 'জানি! জানি! আমিই সৃষ্টি করেছি অমর সেই আত্মাকে, লোহার খাঁচায় এখনও সে বন্দি। যাচ্ছি, আমি ওখানেই যাচ্ছি।'

একী কথা! শুনলেও যে দোজখে যেতে হবে! বুকে ক্রস আঁকলেন যাজক।

লাফ দিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেন মাস্টার, 'আমার আত্মা! আমার আত্মা...' বিলাপের সুরে বলে চলেছেন। আওয়াজটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

জেরাঁদে, অবার্ট আর স্কলাস্টিকা, তিনজনই ছুটল জ্যাকারিয়াসের পেছন পেছন। পথ দুর্গম। তার ওপর ঝড়ো হাওয়া আর তুষারপাত। সামান্য দূরেও দেখা যায় না। কনকনে ঠাণ্ডায় বরফের সাদা কণা উড়ছে বাতাসে। প্রকৃতি নিজেই আজ রণ সাজে সেজেছে।

মাস্টার জ্যাকারিয়াস কোথায়? সামনে একটা অনুর্বর জমি, তারপর একটা পাথুরে পল্লী, তারপর আকাশে খোঁচা দেয়া তীক্ষ্ণ চূড়াবহুল ভয়ঙ্কর গিরিখাত।

প্রাণে কোন ভয় নেই বৃদ্ধ মাস্টার জ্যাকারিয়াসের। উন্মাদের মত ছুটছেন তো ছুটছেনই। অমানুষিক শক্তিতে ছুটে চলেছেন বহুদূরের ভাঙা দুর্গটার দিকে।

'আত্মা...আত্মা...আমার আত্মা...ওই ওখানে! কেল্লায়!'

আঁদেরনাতের দুর্গে ভাঙাচোরা পাথর, থাম, খিলান, হলঘর ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দূর থেকেও দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা কালো থাম দুলে দুলে উঠছে হাওয়ার ঝাপটায়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! দুলছে অথচ পড়ছে না। থামের ওপাশে মৃত্যুপুরীর মত হলঘরের পর হলঘর। অন্ধকার, নির্জন, পরিত্যক্ত, ভয়ঙ্কর। ফাঁক ফোকর গর্তে হাজারো বিষধর সাপের আখড়া।

দুর্গে প্রবেশের গুপ্তপথ আবর্জনা আর ভাঙা পাথরে প্রায় ঢেকে গিয়েছে। আশ্চর্য! মাস্টার জ্যাকারিয়াস ঠিকই চিনে নিলেন পথ। উল্কাবেগে নেমে গেলেন সেই পথ দিয়ে নিচের একটা উঠোনে, সেখান থেকে একটা টানা বারান্দায়।

শোনা যায় আঁদেরনাতের এ দুর্গে এখন অশরীরী ছাড়া আর কেউ থাকে না। এককালে এই দুর্গের নামে বুক কেঁপে উঠত সাহসী মানুষেরও। কোন এক ডাকাত-জমিদার বানিয়েছিলেন দুর্গটা। তাঁর বংশ নিশ্চিহ্ন হবার পর দুর্গের গোপন আশ্রয়ে জাল

টাকা তৈরীর কারখানা খুলে বসেছিল একদল জোচ্চোর। পুলিশ এসে তাদের ফাঁসিতে লটকে দিয়েছিল এখানেই। সেথেকেই এই দুর্গ একেবারেই পরিত্যক্ত। মানুষ থাকে না। শোনা যায়, রাত বিরেতে শয়তানের নাচের আসর বসে ভাঙা হলঘরে। বিকট স্বরের গান আর ভীষণ নাচের ছন্দে গমগম করতে থাকে আঁদেরনাতের পড়ো দুর্গ।

ভূত-প্রেত-দৈত-দানবের এই কথিত আস্তানায় নিশ্চিন্তে প্রবেশ করলেন জ্যাকারিয়াস। বাধ্য হয়েই তাঁর পেছন পেছন স্কলাস্টিকা, জেরাঁদে আর অবার্টকেও ঢুকতে হলো।

মনে হলো কে যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাস্টারকে। অদৃশ্য হাতে হাত ধরে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। তা নাহলে গোলকধাঁধার মতো এই অন্ধকারময় গলিঘুপচির মধ্যে নির্ভুল লক্ষ্যে ছুটে গিয়ে পাল্লা-দেয়া দরজাটার সামনে পৌঁছোলেন কি করে তিনি?

গায়ের জোরে দরজায় ঘুসি মারলেন মাস্টার। প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। চিৎকার করছেন তিনি বুকফাটা গলায়, সেই সঙ্গে হাত চলছে। আঘাত সইতে না পেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল হেলে পড়া পুরোনো দরজা।

ভেতরে একটা হলঘর। মস্ত তার আকৃতি। অন্য সব ঘরের চেয়ে বড়। কালো ঝুল, মাকড়শার জাল আর চামচিকে-বাদুড়ের আড্ডা এঘর, বহুদিন ধরে অব্যবহৃত। দেওয়ালের ব্রাকেটে সাজানো আছে বিষধর সাপ, ভূত-প্রেত আর অদ্ভুত সব কাল্পনিক ভয়ানক প্রাণীর সারি সারি মূর্তি। পরিবেশটা ভৌতিক। বাতাসের বাড়িতে বুক চাপড়ানোর মত হাহাকার করে আছড়ে পড়ছে নড়বড়ে জানলার পাল্লা।

ঘরের মাঝে দৌড়ে গেলেন মাস্টার। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে

উঠলেন উন্মাদনা ভরা উল্লাসে।

ঘড়ি...ঘড়ি...ঘড়ি! জ্যাকারিয়াসের প্রাণ ভোমরা সেই লোহার ঘড়িটা ঝুলছে দেয়ালের আংটা থেকে। অত্যন্ত সুন্দর শৈল্পিক একটা ঘড়ি। মাস্টারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গড়নটা রোমক মন্দিরের অনুকরণে করা। মন্দিরের প্রকাণ্ড কপাটের মাথায় বিশাল গোলাপ। গোলাপের বারোটি পাপড়িতে ঘড়ির বারোটি সংখ্যা বসানো। প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টা-নিনাদের সময়ে দুফাঁক হয়ে খুলে যায় মন্দিরে কপাট। একটা তামার পাতে জ্বলজ্বল করে ওঠে স্রষ্টার মহান বাণী। একেক সময়ে একেকটা বাণী, যাতে একঘেয়েমির শিকার হতে না হয়। যখন যেটি প্রয়োজন, স্রষ্টার নির্দেশ ঠিক সে ভাবেই ফুটে ওঠে তামার পাতে। আজ হতে বিশ বছর আগে ধর্মভীরু মাস্টার জ্যাকারিয়াস ঐশী প্রেরণাতেই সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন আশ্চর্য এই ঘড়ি।

ভীষণ আনন্দে দ্রুত পায়ে এগিয়ে ঘড়িটা ধরতে গেলেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস, ঠিক তখনই কে যেন বিকট গলায় অট্টহাসি হেসে উঠল কানের কাছে।

সেই কুৎসিত বামণটা!

'কে, কে তুমি?' আঁৎকে উঠলেন মাস্টার।

'আমি? হাঃ হাঃ হাঃ! আমি পিত্তোনোচ্চিয়ো, এ ঘড়ির মালিক! অনেক দাম দিয়ে এ-ঘড়ি আপনার থেকে আমিই কিনেছিলাম, মাস্টার জ্যাকারিয়াস।'

'কিন্তু এ-ঘড়িতে যে আমার আত্মার অংশ রয়েছে!'

'সেজন্যেই ঘড়িটা আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিতে চাই, মাস্টার,' বিনয়ের অবতার সাজছে বামণ। 'কিন্তু কি দাম চেয়েছিলাম মনে আছে? আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে।'

কথাটা শুনেই পেছন থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল অবার্ট। বাঘের মতো তেড়ে গেল হতকুচ্ছিত বামণটাকে লক্ষ্য করে! এত বড় স্পর্ধা! জেরাঁদের স্বামী হবে? অবার্টের জান থাকতে নয়!

কিন্তু পিত্তোনোচ্চিয়ো যেন হাওয়া দিয়ে তৈরি। হাওয়ার মতই উধাও হলো সে হলঘর থেকে। এক নিমেষের বেশি লাগল না। হাহাকার করে উঠে তার পেছন পেছন ছুটে গেলেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস।

অন্ধকারের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল ওরা তিনজন, জেরাঁদে, অবার্ট আর স্কলাস্টিকা। মনে হলো জমাট আঁধার দিয়ে তৈরি ছায়ার মত নিশাচররা ঘুর ঘুর করছে ঘরময়, যেন অলৌকিক নীলচে আলো ঘুরছে থেকে থেকে এদিক থেকে সেদিকে। টুঁটি-টেপা নৈঃশব্দ্য চুরমার করে মাঝে মাঝে বেজে উঠছে ঘড়িটা, যেন মরণের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

এই ভাবেই ভোর হলো। ভগ্নস্তূপের মধ্যে হন্যে হয়ে ওরা খুঁজল মাস্টারকে, কিন্তু পাওয়া গেল না তাঁকে। প্রকাণ্ড দুর্গের গোলক ধাঁধার মতো হাজারো সুড়ঙ্গপথে জ্যান্ত প্রাণীর চেহারা দেখা গেল না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা কখনও নেমে গেল পাতালে, কখনও উঠে এলো পাহাড় চুড়োর কাছাকাছি। গলা ছেড়ে মাস্টারকে ডাকল ওরা। দিকে দিকে ভেসে গেল ওদের আকুল আহ্বানের ধ্বনি। একটু পরই ফিরে এলো প্রতিধ্বনি হয়ে। একটা আওয়াজের সঙ্গে আরেকটা আওয়াজ মিলে মিশে একাকার হলো। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কেউ ছুটে এলো না।

সকালে ঘুরতে ঘুরতে ওরা আবার এসে পৌঁছোল প্রকাণ্ড সেই হল ঘরে। দেখল, মাস্টার জ্যাকারিয়াস হাজির সেখানে। দাঁড়িয়ে আছেন মড়ার মত আড়ষ্ট শরীরে। আর...একটা মস্ত পাথরের টেবিলে আরাম করে জমে বসে আছে সেই শয়তান বামণটা।

ওরা তিনজন অবসন্ন দেহে ঘরে ঢুকতেই পাগলের মত ছুটে এলেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস।

জেরাঁদের হাত ধরে বললেন, 'জেরাঁদে, ওই দেখো তোমার হবু স্বামী। ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।'

'না! না!! না!!! কক্ষণো তা হতে পারে না!' শিউরে উঠল জেরাঁদে ভয়ঙ্কর সেই কথা শুনে।

অমনি হো-হো-হো-হো করে হেসে উঠল বিটকেল বামণ!

উত্তেজনায় গলা ভেঙে গেল মাস্টারের, 'না কোরো না, জেরাঁদে। আমাকে বাঁচতে দাও। ওই ঘড়ির মধ্যে আটকে আছে আমার প্রাণপাখি। ও ঘড়ি ওই লোকটার। চাবি ওর কাছে। ঈশ্বর জানেন কতদিন ঘড়িতে দম দেয়া হয়নি, তেল দেয়া হয়নি, যত্ন নেয়া হয়নি। হয়তো চাকায় চাকায় মরচে পড়েছে। স্প্রিংগুলো এখনও কাজ করে চলেছে, কিন্তু বন্ধ হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

'জেরাঁদে, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? ওই ঘড়ি যদি এখুনি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমিও সঙ্গে সঙ্গে মারা যাব। কিন্তু আমার যে মরা উচিত নয় কোনমতেই। আমি যে মাস্টার জ্যাকারিয়াস। ঘড়ির স্রষ্টা আর নিয়ন্ত্রক মাস্টার জ্যাকারিয়াস। আমি মরলে যে দুনিয়ার সর্বনাশ। দ্যাখো একবার, চেয়ে দ্যাখো, পাঁচটা বাজতে চলেছে। দ্যাখো কি বাণী শোনায় আমার ঘড়ি।'

ঢং-ঢং শব্দ করে বাজল পাঁচটা। আর রক্তের অক্ষরে তামার ফলকে ফুটে উঠল অদ্ভুত একটা অনুশাসন:

'বিজ্ঞান বৃক্ষের ফল তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে।'

হতভম্ব হয়ে গেল জেরাঁদে আর অবার্ট। একী সর্বনেশে বাণী! এ বাণী তো কখনও ফুটে ওঠেনি মাস্টার জ্যাকারিয়াসের ঘড়িতে? এ যেন স্রষ্টার নির্দেশ নয়, শয়তানের কু-মন্ত্রণা।

মাস্টার জ্যাকারিয়াস পাগলের মত বলে চললেন, 'জেরাঁদে, আমাকে অমর হতে হবে, অবিনশ্বর হতে হবে। একমাত্র এই ঘড়িটাই এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। বন্ধ হবার আগেই তুমি বিয়ে করো ওকে, মহাকালকে। আমি জানি বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে, আমিও অবিনশ্বর হব।'

ফিস ফিস করে বলল অবার্ট, 'জেরাঁদে, তুমি আমার ভাবী বউ।'

জেরাঁদে আচ্ছন্নের মত বলল, 'কিন্তু বাবার প্রাণ যে আমার ওপর নির্ভর করছে, অবার্ট।'

'ব্যস, জেরাঁদে কথা দিয়েছে,' খুশি চাপতে না পেরে বলে উঠলেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস। 'পিত্তোনোচ্চিয়ো, আজ রাত ঠিক বারোটায় বিয়ে কোরো জেরাঁদেকে। কিন্তু তার আগে দাও আমার ঘড়ির চাবি। ওটা আমি এক্ষুণি চাই।'

'এই নিন,' প্রকাণ্ড সাপের মত পাকানো একটা চাবি বের করে দিল বামণ।

ছোঁ মেরে চাবিটা কেড়ে নিয়ে ঘড়ির সামনে ছুটে গেলেন মাস্টার। দম দিতে লাগলেন পাগলের মত বিরামহীন ভাবে, দম যেন ফুরোয় না। কিন্তু ফুরিয়ে আসছে তাঁর নিজের প্রাণ শক্তি। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে চাবি ঘুরছে তো ঘুরছেই, এর যেন কোন শেষ নেই। মাস্টার নেতিয়ে পড়ছেন। অবশেষে শেষ হলো দম দেয়া।

'এক শতাব্দীর জন্যে নিশ্চিন্ত। অনেক দম দিয়েছি,' বলেই মাস্টার লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে। পড়ে রইলেন নিথর নিস্পন্দ দেহে।

অবার্ট আর সইতে পারল না। প্রাণের বিনিময়ে কন্যাসমর্পণ হতে চলেছে শয়তানের হাতে। এ দৃশ্য কি দেখা যায়? ছুটে বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে, ভাঙা দুর্গ থেকে। ছুটতে ছুটতে

হাজির হলো মঠের সেই যাজকের কাছে।

সব শুনলেন তিনি। অবার্টের কাতর আহ্বানে সাড়া দিলেন। রাজি হলেন সাধ্যমতো করতে। বললেন, 'চলো, আমি যাচ্ছি।'

এদিকে সেই হলঘরে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে জেরাঁদে। কাঁদতে ভুলে গেছে। দেহে প্রাণ আছে, মাথায় চেতনা নেই। জ্যাকারিয়াস বারবার ছুটে যাচ্ছেন ঘড়ির সামনে। কান পেতে আছেন। মন দিয়ে শুনছেন টিকটিক করে চলছে কিনা হৃৎপিণ্ড। স্কলাস্টিকা নিজেও যেন পাথর হয়ে গেছে ব্যাপার দেখে। অদ্ভুত অনুশাসন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফুটে উঠছে তাম্রফলকে। যেমন: 'ঈশ্বরের সমান হতে হবে মানুষকে!'

অথবা

'মানুষ হবে বিজ্ঞানের গোলাম। বলি দেবে আত্মীয় স্বজনকে।'

সাপের মত ফোঁস-ফোঁস করে ঘুরছে ঘড়ির কাঁটা। শেষকালে অতি উত্তেজনায় ঝিমিয়ে পড়লেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। সাপের হিসহিস শব্দে কাঁটা এগোচ্ছে রাত বারোটার দিকে।

হলঘরে প্রবেশ করল অবার্ট আর মঠের যাজক। বারোটা বাজতে আর দেরি নেই। স্প্রিং থেকে কড়-ড়-ড় আওয়াজ বেরোচ্ছে। ঘণ্টা বাজল বলে। আচমকা একটা কাণ্ড ঘটল। ছুটে গিয়ে ঘড়ির সামনে হাত বাড়িয়ে ধরলেন যাজক।

অমনি থেমে গেল লোহার ঘড়ি। স্তব্ধ হলো স্প্রিং। কাঁটা বারোটার কাছে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। বারোটা আর বাজল না। কোনদিনই বাজবে না।

একী!

পার্থিব যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন মাস্টার জ্যাকারিয়াস। পাঁজর

যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ভীষণ যন্ত্রণায়। ঘোলাটে চোখ মেলে শেষবারের মত দেখলেন তিনি শয়তানে পাওয়া ঘড়িটার সর্বশেষ অশুভ বাণী:

'ঈশ্বরের সমান হতে চাইলে দোজখ তার অবধারিত।'

মাত্র এক সেকেন্ড নিরবে কাটল, পরমুহূর্তে যেন বোমা ফাটল ঘড়ির ভেতর। ফেটে চৌচির হয়ে গেল ঘড়িটা মাঝখান থেকে। ছিটকে গেল স্প্রিং-চাকা-কলকজা। সাপের মত কিলবিলিয়ে পালাতে চেষ্টা করল আশ্চর্য স্প্রিংটা। ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা ধরতে গেলেন মাস্টার। আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন কান্নার সুরে, 'এসো, এসো, ফিরে এসো, এসো, এসো আমার আত্মা...আমার কাছে ফিরে এসো!'

কিন্তু কিছুতেই ধরা দিল না সাপের মতো স্প্রিংটা। একেবেঁকে সরসর করে প্রতিবারই ফসকে গেল জ্যাকারিয়াসের মুঠো থেকে।

কিন্তু খপ করে স্প্রিংটা চেপে ধরল পিত্তোনোচ্চিয়ো। চমকে গেল সবাই। স্প্রিংটা বামণ ধরা মাত্রই যেন মাটি ফুঁড়ে পাতালে মিলিয়ে গেল তার কুৎসিত মূর্তি। নরকে নিয়ে গেল মাস্টার জ্যাকারিয়াসের আত্মা।

ধড়াস করে পড়ে গেলেন মাস্টার। নিষ্প্রাণ দেহ আর নড়ল না।

কিছুদিন পর বিয়ে হয়ে গেল অবার্টের সঙ্গে জেরাঁদের। সারা জীবন দু'জনে ওরা প্রার্থনা করল ঈশ্বরের কাছে, যাতে দিকভ্রান্ত জ্ঞান-তাপসের আত্মা শান্তি পায়।

এক

যদি কম করে ধরা যায় তাহলেও সংখ্যায় ওরা সাত থেকে আটশো। উচ্চতা মাঝারি। বলিষ্ঠ, চটপটে, নমনীয়। হাত-পায়ের ক্ষিপ্রতা আর বিদ্যুৎগতি এমনই অসাধারণ যে বিপুল কর্মশক্তির প্রকাশ ঘটছে দেহের কাঠামোয়।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ডুবু ডুবু, তখন পড়ন্ত আলোয় নাচানাচি লাফঝাঁপ করছিল তারা। পাহাড়ের ওপরে থেকে শেষ রশ্মি ঝিকমিক করছে তাদের চঞ্চল ক্ষিপ্র মজবুত দেহগুলোর ওপর। লাল একটা বাসনের মত সূর্যটা একটু পরেই মুখ লুকাবে পাহাড়ের ওপাশে। অন্ধকার নামবে। অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে ওরা। এখনই অন্ধকার নেমে এসেছে পর্বত বেষ্টিত উপত্যকায়।

হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল পুরো বাহিনী। পর্বত চূড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তাদের দলপতি। রুক্ষ খাঁজকাটা এবড়োখেবড়ো পর্বত চূড়ায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সে দুই পা বেঁকিয়ে। মহাপর্বতের দূর শীর্ষে অবস্থানরত মিলিটারি ঘাঁটি থেকে দেখা যায় না গাছপালার আড়ালে কি কাণ্ড চলছে এখানে।

তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দে শিস্ দিয়ে উঠল দলপতি, 'ফুঁ...ফুঁ।'

কোরাস গানের মত সুর মিলিয়ে ত্রুটিহীন অনুকরণ করল

অদ্ভুত সৈন্যবাহিনী, 'ফুঁ...ফুঁ।'

দলপতি লোকটা কিন্তু মানুষ হিসেবে সত্যিই অসাধারণ। দীর্ঘকায় দেহ। পরনে বানরের চামড়ার পোশাক! হাওয়ায় উড়ছে মাথাভর্তি উস্কখুস্ক লম্বা চুল। আঁচড়ানো হয় না কতকাল কে জানে। গালভর্তি রুক্ষ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পায়ে জুতো নেই। পায়ের পাতা কড়া পড়ে শক্ত হয়ে গেছে।

সামনে হাত বাড়িয়ে পর্বতমালার নিচটা ইশারা করে দেখাল দলপতি।

যেন পুতুলনাচের সুতোয় টান পড়ল। একই সঙ্গে সাত-আটশো পুতুলের হাত নির্দেশ করল নিচের দিকটা। আশ্চর্য এই একতা অতুলনীয় সামরিক ঐক্য অথবা যান্ত্রিক দক্ষতা, দুটোর যেকোনটাই হতে পারে।

হাত নামিয়ে নিল দলপতি। ক্রল করতে তৈরি হয়ে গেল সাত-আটশো সাগরেদ। একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘোরাতে শুরু করল দলপতি। অনুকরণ করল তার অনুগত সেনাবাহিনী। সাত-আটশো লাঠি বাতাসে চাবুকের শব্দ তুলে ঘুরতে লাগল উইন্ড মিলের চাকার মত।

ঘুরে দাঁড়াল দলনায়ক, চলে গেল ঝোপঝাড়ের আড়ালে। চার হাত পায়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল সে গাছের তলা দিয়ে। পুরো দলটা পেছন পেছন হামাগুড়ি দিয়ে এলো একই ভাবে।

দশমিনিটও গেল না। বৃষ্টিতে ধোয়া পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে চলল সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী। অত্যন্ত সাবধান তারা। অতবড় একটা বাহিনী কুচকাওয়াজ করছে, এগিয়ে চলেছে দ্রুত, অথচ একটা পাথরও স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে গেল না। চারপাশে কোন শব্দ নেই। নিস্তব্ধ বনভূমি নিথর সেই আগেরই মত।

পনেরো মিনিট গেল এইভাবে তারপর থামল দলনায়ক। তার

পেছনে থেমে গেল পুরো বাহিনী । যেন সারি সারি পাথরের মূর্তি। নিথর, নিশ্চল, নিষ্কম্প।

শ-দুই গজ দূরে সমতলে দেখা গেল শহরটাকে। জাহাজ যেখানে নোঙর করে, সেই জায়গার ধারে মোটামুটি বড় শহরটা। অসংখ্য আলো দেখা যাচ্ছে–বন্দর, ভিলা, বাড়ি আর সামরিক ছাউনিতে। আলোগুলো দূর থেকে দেখে মনে হয় জটিল একটা চিত্র, যেন রাতের আকাশেরই প্রতিচ্ছবি। তারও ওদিকে, শান্ত পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে যুদ্ধজাহাজ, সওদাগরী জাহাজ আর সেতু নির্মাণের জন্যে তৈরি চ্যাপ্টা পাটাতনের পল্টুন নৌকো। তারও পরে, ইউরোপা পয়েন্টের প্রান্তে, তীব্র সাদাটে আলো ছড়াচ্ছে লাইটহাউসটা।

হঠাৎই গর্জে উঠল একটা কামান। ওই একবারই। ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আওয়াজ। তারপর নিরবতা নামল। ঝোপঝাড় খানাখন্দে লুকোনো সামরিক বাহিনীর প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঢেউ তুলে দূর হতে দূরান্তে আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গম্ভীর নিনাদে বেজে উঠল ঢাক। সেই সঙ্গে ফাইফ নামের ছোট বাঁশির তীব্র সুরেলা আওয়াজ চিরে দিল সন্ধ্যার আকাশ-বাতাস।

পিছু হটার সঙ্কেত ছিল শব্দের মধ্যে। কামান নির্ঘোষ, ঢাকের আওয়াজ আর বাঁশির ধ্বনির মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দেয়া হলো, এখন ঘরে ফেরার সময়। শহরের পথে-ঘাটে আর কোন আগন্তুককে ঘুরঘুর করতে দেয়া হবে না একা। এখন থেকে সঙ্গে থাকবে দুর্গরক্ষীদের অন্তত একজন, অথবা কোন অফিসার। জাহাজের নাবিকদেরও এখন জাহাজে উঠে পড়ার সময়। একা যারা পথে পথে ঘুরছিল অথবা মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হয়েছে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই তাদের ফিরিয়ে আনা হলো রক্ষীভবনে।

কাজকর্ম শেষ। এবার নিস্তব্ধতা নামল চারদিকে।

এবার নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন ম্যাক্‌কামেল।

রক অফ জিব্রাল্টারে সে রাতে আর ভয়ের কিছু নেই ইংল্যান্ডের। অন্তত তাঁর তা-ই ধারণা।

দুই

ভয়াবহ এই রকের নাম সবাই শুনেছে। সিংহের সঙ্গে রয়েছে তার অসম্ভব মিল। সে যেন গুঁড়ি মেরে বসে মুখ ফিরিয়ে আছে স্পেনের দিকে। ল্যাজটা তার সাগরে। সাতশো কামানের নলগুলোকে বলা যায় তার সারি সারি দাঁত। দুর্গপ্রাচীরের ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আছে কামানের নল। যেন সাতশো ধারালো দাঁত। লোকে বলে ওগুলো বুড়ির দাঁত। যখন তখন কামড়ায় না! আক্রান্ত না হলে দাঁত বের করে ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকে।

ইংল্যান্ডের ঘাঁটি তাই এখানে অত্যন্ত সুদৃঢ়, যেমন সুদৃঢ় এডেনে, মাল্‌তায়, হঙকঙে। পাহাড়ে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল সমারোহ। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ়তর হচ্ছে ঘাঁটিগুলো। একদিন হয়তো সারা ইংল্যান্ডই দুর্গে পরিণত হবে এভাবে।

প্রণালীর পনেরোশো মাইলের মধ্যে কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে বৃটেন। প্রভুত্ব বজায় রেখেছে ভূমধ্য সাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।

কিন্তু এই উপদ্বীপ কিন্তু আসলে স্পেনের। হৃত অঞ্চল পুনর্দখলের আশা ত্যাগ করেনি স্পেন। কিন্তু দখলের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেন না, সমুদ্র পথে অথবা স্থল পথে সেখানে সৈন্য

পাঠানো আর সম্ভব নয়।

স্পেন মুখ গুঁজে ঘরের এক কোণে বসে থাকতে পারে বৃটেনের সামরিক দাপটে, কিন্তু একজন আছে যে স্পেনের সাহায্য পাবার জন্যে বসে নেই।

সুরক্ষিত এই উপদ্বীপকে বাহুবলে পুনর্দখলের স্বপ্ন দেখছে একজন। একটু আগে বলা সেনাবাহিনীর দক্ষ দলপতি সে। অদ্ভুত মানুষ। তাকে উন্মাদ বলা যায়। স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোকটির নাম জিল ব্রাল্টার। নামের একটা প্রভাব পড়েছে তার ওপর। জিব্রাল্টার তাকে পুনর্দখল করতেই হবে। মান রাখতে হবে স্পেনের।

তার মধ্যে বেশ পাগলামি আছে। সত্যি বলতে কী, তার স্থান হওয়া উচিত ছিল পাগলা-গারদে। জিল ব্রাল্টারকে চেনে সবাই, কিন্তু দীর্ঘ দশ বছর তার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে ছিল অ্যাদ্দিন। অনেকে ধারণা করতে পারে সে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। আসলে তা মোটেই সত্যি নয়। পিতৃপুরুষের নিবাস ছেড়ে সে এক ইঞ্চিও নড়েনি।

আদিমকালের গুহাবাসীদের মত সে থেকেছে অরণ্যে, পর্বতগুহায়। বিশেষ করে স্যান মিগুয়েল গুহার অনাবিষ্কৃত গহীনে। ওই গুহার বিস্তৃতি সমুদ্র পর্যন্ত। যায় না কেউ ওখানে। সবাই জানত, মারা গেছে জিল ব্রাল্টার। কিন্তু সে বেঁচে রয়েছে বহাল তবিয়তে। বুনো মানুষদের মতই স্বাধীন মুক্ত পরিবেশে। তার মানবিক যুক্তিবুদ্ধি লোপ পেয়েছে সেই কারণেই, রয়ে গেছে কেবল জান্তব প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির অনুশাসনই কেবল সে মানে—আর কিছুরই তোয়াক্কা করে না।

তিন

গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছিলেন জেনারেল মাক্‌কামেল। সামরিক আইন অনুযায়ী যদিও এর চাইতেও অধিক আরাম তাঁর প্রাপ্য, কিন্তু ঘুমোনোর চাইতে বড় আনন্দ তাঁর কাছে আর কিছু নেই।

ইংরেজ সেনাধ্যক্ষদের দৈহিক আকৃতি এমনিতেই নিম্নস্তরের, কিন্তু এই ম্যাককামেল, ইনি আরও দুঃখজনক ধরনের; মানে, অত্যন্ত কদাকার ও বিদঘুটে। সত্যি বলতে অসাধারণ কুৎসিত। অস্বাভাবিক দীর্ঘ বাহু। ঝোপের মত ঠেলে বেরিয়ে আসা ভ্রূ দুটোর নিচে গর্তে বসা দুটো গোলাকার চোখ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সর্বক্ষণ বেরিয়ে আছে উঁচু উঁচু বড় বড় দাঁত। তাঁর অঙ্গভঙ্গি অনেকটাই বাঁদরের সঙ্গে মিলে যায়। চোয়ালের হাড় উঁচু—সব মিলিয়ে অত্যাশ্চর্য কদাকার এই ব্যক্তিটি ইংরেজ জেনারেলদের হাস্যকর মানদণ্ডও রক্ষা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। মানুষ নয়, যেন একটা বাঁদর। তা হোক। বাঁদরের সঙ্গে মিল থাকলেও তিনি যে অত্যন্ত দক্ষ একজন সেনাপতি এতে কোন সন্দেহ নেই।

সেনাধ্যক্ষ এখন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন তাঁর ওয়াটার পোর্ট স্ট্রীটের বাড়ির বেডরুমে। রাস্তাটা ওয়াটার পোর্ট গেট থেকে আলামেদা গেট পর্যন্ত গিয়েছে শহরের বুকের ওপর দিয়ে আঁকিবুকি কেটে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন? সুযোগ মত মিশর, তুরস্ক, হল্যান্ড, আফগানিস্তান, সুদান থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ড দখল করবে ইংল্যান্ড? হয়তো দেখছিলেন।

কিন্তু তিনি দেখছিলেন এমন একটা সময়ে যখন খাস জিব্রাল্টারটাই যেতে বসেছে ইংল্যান্ডের দখলের বাইরে!

দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা।

ঘুম ভাঙতেই চমকে উঠে বসলেন জেনারেল।

'কি হলো?'

কামানের নিক্ষিপ্ত গোলার মত ঘরে ঢুকল সেনাপতির সচিব। 'স্যার, শহর আক্রান্ত হয়েছে!'

'স্পেনের ভিখিরিগুলোর কাণ্ড নিশ্চয়?'

'মনে হয়, স্যার।'

'স্পর্ধা তো কম নয়...'

কথাটা শেষ করলেন না জেনারেল। প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়লেন. একটানে খসিয়ে আনলেন নৈশকালীন মস্তকাবরণ, লাফ মেরে ঢুকে গেলেন প্যান্টের মধ্যে, আলখাল্লাটা টান মেরে জড়িয়ে নিলেন শরীরে, পা দুটো সড়াৎ করে ঢুকিয়ে দিলেন বুট জোড়ার মধ্যে, মাথায় এঁটে বসিয়ে নিলেন হেলমেট এবং কোমরে তরবারির কোমরবন্ধনীর বাক্‌ল্ আঁটতে আঁটতে বললেন, 'হট্টগোলটা কিসের?'

'স্যার, বড় বড় পাথরের চাঁই পাহাড় থেকে খসে পড়ছে শহরে, সেই শব্দ।'

'দলে ভারী মনে হচ্ছে?'

'জ্বী!'

'হুম! উপকূলের সব লুঠেরাগুলো দল পাকিয়েছে। হঠাৎ চড়াও হয়ে আমাদের কাবু করবে ভাবছে! ব্যাটারা হাত মিলিয়েছে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে। রোভার, স্মাগলার, স্যান রোকের জেরে, গাঁ-ভর্তি উদ্বাস্তু—সবাই জোট পাকিয়েছে নিশ্চয়?'

'আমারও তাই মনে হয়, স্যার।'

'গভর্নরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে?'

'জ্বী না। ইউরোপা পয়েন্টের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফটকের দখল নিয়ে নিয়েছে শত্রু, সব কটা রাস্তায় গিজগিজ করছে ওরা।'

'ওয়াটারপোর্ট গেটের সেনা-ছাউনির কি খবর?'

'সেখানে আর যেতে পারলাম কই! ব্যারাকের মধ্যেই বোধহয় সৈন্যদের তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।'

'তোমার সঙ্গে লোক কত আছে?'

'জনা বিশেক। থার্ড রেজিমেন্টের যে-কজন সরে পড়তে পেরেছিল, শুধু সেই ক'জন।'

'হায়! হায়! এক দঙ্গল কমলালেবুর ফেরীওলা জিব্রাল্টারকে ছিনিয়ে নেবে ইংল্যান্ডের কব্জা থেকে? না, কক্ষনো না। সেন্ট ডান্সটনের শপথ, আমি তা হতে দেব না!'

ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল শোবার ঘরের দরজা। প্রবেশ করল অদ্ভুত একটি মূর্তি, লাফ দিয়ে চড়ে বসল জেনারেলের কাঁধে।

চার

'আত্মসমর্পণ করুন!' কর্কশ কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল প্রাণীটা। মানুষের নির্দেশ না বলে তাকে পাশবিক হিংস্র গর্জনই বলা উচিত।

সেনাপতির সচিবের পেছন পেছন যেকজন সৈনিক ঘরে ঢুকেছিল, তারা আততায়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, কিন্তু তার চেহারা একটু খেয়াল করে দেখতেই ভয়ে পিছিয়ে গেল। ওরা আতঙ্কিত। সবার মুখেই একই কথা, 'জিল ব্রাল্টার!'

স্পেনের সেই ভদ্রলোকই বটে। অনেকদিন পর তাকে দেখা

গেল ! স্যান মিগুয়েলের গুহাবাসী সেই ভয়ানক বর্বর।

'আত্মসমর্পণ করবেন কিনা বলুন!' আবার হুঙ্কার ছাড়ল স্পেনের জীবটি।

'কক্ষনো না!' সমান তেজে জবাব দিলেন জেনারেল ম্যাককামেল।

সৈনিকরা সাহস করে তাকে চারদিক থেকে ঘিরতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু আচমকা তীব্র শিস দিল জিল ব্রাল্টার। তীক্ষ্ণ কান ঝালাপালা করা আওয়াজটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, বাড়ির উঠানে পিলপিল করে ঢুকে পড়ল হানাদার বাহিনী।

কিন্তু একী দৃশ্য! স্বচক্ষে দেখেও যে বিশ্বাস করা যায় না! এ যে বাঁদর বাহিনী! দলে দলে ওরা ঢুকছে উঠানে, ছেয়ে ফেলছে বাড়ি-ঘর-দোর!

শয়ে শয়ে ঢুকছে, শেষ নেই যেন! রকের আদি বাসিন্দা তো এরাই। বৃটেনের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি কল্পে ক্রমওয়েল এ দেশ দখলের স্বপ্ন দেখার অনেক আগে থেকে এরাই তো বসবাস করেছে জিব্রাল্টারে। হারানো দেশ পুনর্দখলের আশায় শেষ পর্যন্ত পর্বতের আশ্রয় ছেড়ে নেমে এসেছে তারা।

নিঃসন্দেহে তাই। সংখ্যায় এরা অগুনতি। এই বানরদের চৌর্যবৃত্তিটুকু মেনে নিতে পারলেই তাদের সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব। এরা অত্যন্ত ধড়িবাজ। এদের স্পর্ধাও মাত্রাছাড়া। এদের ঘাঁটালে ঝামেলার শেষ নেই। ওরা প্রতিশোধ নেয় ওপর থেকে শহরের ওপর বিরাট বিরাট পাথর গড়িয়ে দিয়ে। দুঃখজনক এই ঘটনা অতীতেও ঘটেছে বহুবার।

এসব ভয়ঙ্কর স্বভাবের বাঁদরদের একত্র করে সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করেছে উন্মাদ জিল ব্রাল্টার। ভয়ঙ্করতায় সেও বাঁদরদের চাইতে কম যায় না। বাঁদরদের মতই চার হাত পায়ে স্বাধীন

জীবন উপভোগ করেছে জিল ব্রাল্টার, শয়নে স্বপনে একটাই চিন্তা ছিল তার গোলমেলে মগজে—যেভাবে হোক স্পেনের মাটি থেকে ঘাড় ধরে বিদেয় করতে হবে বিদেশী দখলবাজদের!

এ প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তাহলে মুখে চুনকালি পড়বে বৃটেনের। রীতিমতো মাথা কাটা যাবে। হিন্দু, আবিসিনিয়ান, তাসমানিয়ান, অস্ট্রেলিয়ার কালা আদমী, হটেনটট এবং আরও বহু জাতিকে পদানত করার পর শেষকালে কিনা সামান্য বাঁদরদের হাতে মার খেয়ে চম্পট দেবে ইংরেজরা!

এ যদি সম্ভব হয়, তাহলে বেঁচে থেকে এ লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারবেন না জেনারেল ম্যাককামেল, গুলি করে নির্ঘাত উড়িয়ে দেবেন নিজের খুলি!

জেনারেলের সৈন্যরা কিন্তু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই। কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে জিল ব্রাল্টারের ওপর। কিন্তু জিল ব্রাল্টারকে কাবু করা অত সহজ নয়। পাগল ব্রাল্টারকে ধরতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল তারা।

অমানুষিক শক্তি জিল ব্রাল্টারের গায়ে। কিন্তু এতজনের সঙ্গে সে পারবে কেন! দারুণ হুটোপুটির পর শেষ পর্যন্ত বেঁধে ফেলা হলো তাকে, গা থেকে খসিয়ে আনা হলো বাঁদরের চামড়া, মুখে ঠেসে দেয়া হলো কাপড়ের গোঁজ, তালগোল পাকিয়ে তাকে ফেলে রাখা হলো ঘরের কোণে—এমন অর্ধ-উলঙ্গ করুণ অবস্থা যে মুখ দিয়ে হুঙ্কার তো দূরের কথা, হাত-পায়ের আঙুল পর্যন্ত নাড়ানোর ক্ষমতা বেচারার রইল না।

এবার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন জেনারেল। দৃঢ়সংকল্প তাঁর। হয় জিতবেন, নয় মরবেন।

বাইরের অবস্থা আরও বিপজ্জনক। খুব সম্ভব ওয়াটারপোর্ট গেটের কাছে দলবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে সামান্য সৈন্য।

অগ্রসর হচ্ছে জেনারেলের বাড়ির দিকে। বাজার আর ওয়াটারপোর্ট গেটের দিক থেকে কয়েকবার বন্দুকের গর্জনও শোনা গেল।

বাঁদর বাহিনী সংখ্যায় কিন্তু অগুনতি। জিব্রাল্টার সৈন্যবাহিনীর রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছু হটা ছাড়া আর উপায় নেই। বাঁদরদের সঙ্গে এখন যদি স্প্যানিয়ার্ডরা যোগ দেয়, তাহলে দুর্গ ফেলে, ছাউনি ফাঁকা করে দিয়ে জান নিয়ে দ্রুত পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেক্ষেত্রে সম্মিলিত আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে একজনও থাকবে না এই এলাকায়।

কিন্তু একি! হঠাৎই পালটে গেল পরিস্থিতি।

মশালের আলোয় দেখা গেল, পশ্চাদপসরণ করছে বাঁদরবাহিনী। সবার আগে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে চলেছে দলপতি। একই ভাবে প্রতিটি বাঁদর অনুকরণ করছে তাকে। লাঠি ঘোরাচ্ছে, পা ফেলছে, হাত নাড়ছে একই ভঙ্গিমায়। চলেছে পেছনে পেছনে।

জিল ব্রাল্টার তাহলে ম্যাককামেলের ঘর ছেড়ে পালিয়েছে? হাত-পা-মুখের বাঁধন খসিয়ে সাঙ্গপাঙ্গদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে? না, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু উন্মাদটা ওই দিকে চলেছে কোথায়? ইউরোপা পয়েন্টের দিকে? গভর্নর-ভবনে গিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয়ে দাবি জানাবে আত্মসমর্পণের?

কিন্তু তাতো না! দলবল নিয়ে ওয়াটারপোর্ট স্ট্রীট বরাবর এগিয়ে চলেছে পাগলা জিল ব্রাল্টার। আলামেদা গেট পেরিয়ে গিয়ে পার্ক অতিক্রম করে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।

ঘণ্টাখানেক পরে জিব্রাল্টারে রইল না একজন হানাদারও।

আসল ঘটনাটা তাহলে কী?

পার্কের প্রান্তে জেনারেল ম্যাককামেল আবির্ভূত হতেই জানা

গেল বাঁদর বাহিনীর পশ্চাদপসরণ রহস্য।

উন্মাদ জিল ব্রাল্টারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন জেনারেল স্বয়ং। বানরচর্মে নিজেকে আচ্ছাদিত করে চালনা করে নিয়ে গেছেন পুরো বাহিনীটাকে তাদের পাহাড়ী আবাসে। ভদ্রলোক দেখতে এতই কদাকার, অসমসাহসিক সৈনিক পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও আকৃতি প্রকৃতিতে তিনি এমনই বাঁদরের মতো, ধরা খেয়ে গেছে বাঁদরের দল। নির্দ্বিধায় তারা তাঁকে অনুসরণ করে ফিরে গেছে পাহাড় আর জঙ্গলের আবাসস্থলে।

দুর্দান্ত বুদ্ধি, সন্দেহ নেই। অত্যন্ত চালাক মানুষ ছাড়া এমন দারুণ বুদ্ধি কারও মাথায় আসে না। এই বিরত্বের জন্যে পুরস্কারও পেলেন তিনি যথাসময়ে, তাঁকে দেয়া হলো 'ক্রস অফ দ্য অর্ডার অফ সেন্ট জর্জ'।

জিল ব্রাল্টারকে বৃটিশ সরকার নগদ দামে বেচে দিল এক লোকের কাছে। সে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিল তাকে ইউরোপ আমেরিকার দেশে দেশে খাঁচায় পুরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে।

শহরে শহরে খাঁচার জীবটিকে নিয়ে গিয়ে এমন ধারণাও দেয়া হল যে কিম্ভূতকিমাকার এই প্রাণীটিই আসলে জেনারেল ম্যাককামেল স্বয়ং—স্যান মিগুয়েলের বন্যমানব নয় মোটেই।

মহারানীর সরকার কিন্তু ভাল শিক্ষাই পেলো এই ঘটনা থেকে। জিব্রাল্টারকে মানুষ ছিনিয়ে নিতে না পারলেও বাঁদররা পারবে। আসলেই যে তাদের মর্জির ওপর অঞ্চলটার সামরিক নিরাপত্তা নির্ভর করছে এই পরম সত্য অনুধাবন করে বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন ইংল্যান্ড সেই থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রক-এ কেবল মাত্রাতিরিক্ত কদাকার জেনারেলদেরই মোতায়েন করবে, যাতে বাঁদর বাহিনী আবার চড়াও হলে ধোঁকা দেয়া যায়।

সহজ সরল এই সতর্কতার ফলে জিব্রাল্টারের মালিকানা স্বত্ব কিন্তু অক্ষুণ্ন রয়ে গেল চিরকালের জন্য।

উনত্রিংশ শতাব্দী

উনত্রিংশ শতাব্দীর মানুষ বাস করছে যেন রূপকথার জগতে। অবশ্য তারা সেটা বুঝতে পারে না বললেই হয়। বিস্ময় দেখে দেখে চোখ সয়ে গেছে। সবই গা-সওয়া। বিস্ময়-বোধ এখন বিরক্তির পর্যায়ে পৌঁছেছে। সবই এখন সম্ভব, ধরে নিয়েছে সবাই। যা-ই আবিষ্কার হোক, কেউ আর অবাক হয় না।

অতীতের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলে বোঝা যেত সভ্যতা কত দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এই অবস্থানে পৌঁছেছে। আজকের আধুনিক শহরগুলোর তুলনায় সে যুগের শহরগুলোকে কি শহর বলা যায়?

এ-যুগের আধুনিক শহরগুলোর রাস্তা-ঘাট চওড়ায় কমপক্ষে একশো গজ। বাড়িগুলো কম হলে এক হাজার ফুট উঁচু। সব ভবনেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত।

বারো মাসের প্রতি দিনে প্রতিটি ক্ষণে আকাশপথে লেগে আছে হাজার হাজার অ্যারো-কার আর বাসের ভিড়! এক একটা শহরের জনসংখ্যা নিদেনপক্ষে এক কোটি।

এই সব বিশাল চোখ ধাঁধানো শহরের তুলনায় হাজার বছর আগেকার প্যারিস, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক স্রেফ ছোটখাটো গ্রাম। পথঘাট কর্দমাক্ত, আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা অতি জঘন্য।

পথ চলতে গেলেই হাজার ঝাঁকুনি! বিধিব্যবস্থার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, ঘোড়ায় টানা গাড়ি চড়ার আনন্দেই বিহ্বল। হ্যাঁ, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, ঘোড়ায় টানা গাড়ি চড়া হত এই সব শহরে! অবিশ্বাস্য, তাই নয় কি?

উনত্রিংশ শতাব্দীর শহরবাসীরা যদি কখনও স্টীমার আর রেলগাড়ির ঝক্কি-ঝামেলা, ঝঞ্ঝাটময় যানবাহন ব্যবস্থার কথা ভেবে দেখে তাহলে কি অবাক হবে না? সংঘর্ষ গোলযোগ লেগেই থাকত, যানবাহন চলত অতি ধীর গতিতে! আর আজকে? আজকের পর্যটকরা অ্যারো-ট্রেনে চড়ে, স্থল আর জলপথে যায়, সমুদ্রতলে, ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে চলাচল করে বিস্তৃত বায়ুচালিত টিউবের মধ্যে দিয়ে।

অবাক হচ্ছেন? আরও আছে আশ্চর্য যন্ত্র টেলিফোন—পূর্ব পুরুষরা 'টেলিগ্রাফ' নামের যে অনুন্নত যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, তার চাইতেও অনেক অনেক পরিমার্জিত উন্নত টেলিফোন।

ব্যাপারটা ভাবতে গেলে অদ্ভুত লাগে। লাগে এই কারণে যে যেসব মূল সূত্রের ভিত্তিতে এই বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলো সম্ভব হয়েছে, তার প্রতিটিই জানতেন পূর্বপুরুষরা। কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করতে পারেননি।

তাপ, বাষ্প, বিদ্যুৎ এসব মানব সভ্যতার মতই সুপ্রাচীন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে পণ্ডিতরা বলেননি, ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল শক্তিগুলোর একমাত্র তফাৎ হলো ইথীরিয় বস্তুকণার বিশেষ তরঙ্গকম্পনের হার?

শক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক সনাক্ত করতে পারায় পণ্ডিতরা সভ্যতাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তরঙ্গকম্পনের যে হারের তফাৎ থাকার ফলে শক্তিগুলো আলাদা আলাদা ভাবে দেখা দিয়েছে, সেই হার বা রেট নির্ণয় করতেই যে

এতটা সময় লাগল, এটাই অবিশ্বাস্য। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, একটা শক্তি থেকে আরেকটা শক্তিতে যাওয়ার পদ্ধতি, বা একটা ছাড়াই আরেকটাকে উৎপাদন করার পদ্ধতি কিছুদিন আগে মাত্র আবিষ্কার হয়েছে।

সবই আসলে চলছে ঢিমেতালে। এই তো এই সেদিন ২৭৯০ সালে, মাত্র একশো বছর আগে সুবিখ্যাত অসওয়াল্ড নাইয়ার সফল হলেন তাঁর গবেষণায়।

নিঃসন্দেহে মহান পুরুষ তিনি, মানব সভ্যতার এক মহাপুরুষ। মূল আবিষ্কারটিই করেন তিনি। অন্যান্য সব আবিষ্কারের জনক সেই একটি মাত্র আবিষ্কারের ফলেই সম্ভব হলো অন্যান্য আবিষ্কার। আবিষ্কারকদের স্বর্ণযুগের সূচনা হলো তাঁর সেই একটি আবিষ্কারে। আবিষ্কার যুগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পেলাম আমরা অসাধারণ ধীমান জেম্‌স্ জ্যাকসনকে। নতুন অ্যাকুমুলেটরের জন্যে আজ আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী। এই আশ্চর্য অ্যাকুমুলেটরের কয়েকটি টাইপ সৌরকিরণের শক্তিকে পুঞ্জীভূত করতে পারে, কয়েকটি ভূগোলকের কেন্দ্রে অবস্থিত তড়িৎ শক্তিকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। জলপ্রপাত, নদী, বাতাস অথবা অন্যান্য যে কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তিকে জমা করে রাখতে পারার মত অ্যাকুমুলেটরও আবিষ্কৃত হয়ে গেছে তাঁর ওই একটি আবিষ্কার থেকে। তাঁর এই শতাব্দীর বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে আজ আমরা পেয়েছি এমন ট্র্যান্সফর্মার যার একটি মাত্র সুইচ টিপলেই অ্যাকুমুলেটরের জমা শক্তি বেরিয়ে আসে বিরামহীনভাবে—তাপ, আলো, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য যান্ত্রিক শক্তির যোগান দেয়, আমাদের এই অতি-উন্নত সভ্যতার সবরকমের চাহিদা মিটিয়ে দেয়।

হ্যাঁ, এই দুটি যন্ত্রের পরিকল্পনার শুরু যেদিন থেকে, সেইদিন

থেকে সত্যিকার অর্থে শুরু হয়েছে এযুগের উন্নতি। মানুষ জাতটাকে বলতে গেলে অসীম শক্তি যোগান দিয়ে চলেছে এই দুটি যন্ত্র। গ্রীষ্মের উত্তাপ আর শীতের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত করে এই দুটি যন্ত্র কৃষিকাজেও বিপ্লব এনেছে।

আকাশযানে শক্তি যোগান দেয়ার ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে বিপুল হারে। ব্যাটারি অথবা পাওয়ার প্ল্যান্ট ছাড়াই বিরামহীন ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের ফলে এখন অঢেল আলো পাওয়া যাচ্ছে, মোমবাতি বা ইলেকট্রিক বাল্ব আর দরকার নেই। অফুরন্ত শক্তির দৌলতে শিল্পোৎপাদনও বেড়েছে একশো গুণ। এই সব প্রগতির জন্যে আমরা ঋণী অ্যাকুমুলেটর আর ট্র্যান্সফর্মারের কাছে।

সব বিস্ময়কর আবিষ্কারই আপনি দেখতে পাবেন 'আর্থ হেরাল্ড'-এর অফিস-কক্ষে রাখা অতুলনীয় অফিস-বুকে। পত্রিকাটির সম্প্রতি উদ্বোধন হয়েছে ১৬৮২৩ অ্যাভিন্যুতে।

'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা গর্ডন বেনেট যদি আজ নতুন করে দ্বিতীয়বার জন্ম নিতেন, স্বনামধন্য বংশধর ফ্রান্সিস বেনেটের এই মার্বেল পাথর আর সোনায় মোড়া প্রাসাদোপম অফিস দেখে কি বলতেন কে জানে!

তিরিশ পুরুষ ধরে নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডের স্বত্ব বজায় রেখেছে বেনেট পরিবার। দুশো বছর আগে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ওয়াশিংটন থেকে সেন্ট্রোপলিসে যখন স্থানান্তরিত হলো, সরকারের পেছন পেছন খবরের কাগজটিও চলে এলো সেন্ট্রোপলিসে। জায়গা বদলের সঙ্গে সঙ্গে নাম বদলে হয়েছিল 'আর্থ হেরাল্ড'।

ফ্রান্সিস বেনেট টেলিফোনিক সাংবাদিকতার উদ্বোধন ঘটিয়ে বিস্তার ঘটিয়েছেন পিতৃপুরুষের ব্যবসায়ে।

টেলিফোন যন্ত্রের অবিশ্বাস্য সংমিশ্রণে সম্ভব হয়েছে এ উন্নতি তা কারোরই জানতে বাকি নেই। পুরাকালে সকাল হলেই ছাপা খবরের কাগজ পৌঁছোতো ঘরে ঘরে। একালে 'আর্থ হেরাল্ড' কথা বলে যায় ঘরে ঘরে। সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ বা বৈজ্ঞানিক যে খবরটি চান, সংক্ষেপে মুখে মুখে বলে যায় হেরাল্ড সেখবর, সেদিনকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অসংখ্য, ফোনোগ্রাফিক ক্যাবিনেটের দৌলতে মাত্র কয়েক সেন্টের বিনিময়ে সমস্ত দৈনিক সংবাদ চলে আসে গ্রাহকদের নখদর্পণে।

ফ্রান্সিস বেনেটের নতুন এই উদ্ভাবন নবজীবন দান করেছে সুপ্রাচীন এই সংবাদপত্রটিকে। কয়েক মাসেই গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে আট কোটিতে: ডিরেক্টরের রোজগারও বাড়তে বাড়তে তিরিশ কোটি ডলার ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠেছে। বিপুল সম্পদের মালিক হতে পেরে বর্তমান দপ্তর বানিয়েছেন ফ্রান্সিস বেনেট! চার অংশে বিভক্ত এই ভবনের একেকটা অংশ দু'মাইল দীর্ঘ। ছাদের ওপর পতপত করে উড়ছে পঁচাত্তরটা তারকা আঁকা কনফেডারেশনের গৌরবময় বিশাল পতাকা।

ইচ্ছে করলে সাংবাদিক সম্রাট ফ্রান্সিস বেনেট হয়তো দুই আমেরিকার সম্রাটও হতে পারতেন। আমেরিকানরা এমন সম্রাট পেলে অন্তত আপত্তি করত না।

বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শুনে রাখুন, ভূগোলকের প্রতিটি জাতির হোমরাচোমরা লোকরা এসে ছেঁকে ধরে ফ্রান্সিস বেনেটকে, মন্ত্রীরাও কেউ বাদ যায় না। হাজার তোষামোদ করে, বিভিন্ন প্রকল্পে তাঁর উপদেশ অনুমতি চায়। সর্বশক্তিমান এই প্রচারযন্ত্রের সমর্থন লাভের জন্য তাদের কাকুতিমিনতি দেখলে হাঁ হয়ে যেতেন আপনি। ওঁর বেতনভোগী বৈজ্ঞানিক, শিল্পী আর

আবিষ্কারকদের সংখ্যা গুনে শেষ করা কঠিন। তাঁর রাজত্বে বিশ্রাম কি জিনিস কেউ জানে না।

চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী বিরামহীন কাজের ধারা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারতেন কী? অনেক কাজেই মুনাফা নেই, তবুও চালিয়ে যাচ্ছেন ফ্রান্সিস বেনেট। কপাল ভালো, এ যুগের মানুষগুলোর শরীর পাথরের মত শক্ত। স্বাস্থ্যবিধি আর ব্যায়াম বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায় মানুষের গড়পরতা আয়ু সাঁইত্রিশ থেকে বেড়ে আটষট্টিতে গিয়ে পৌঁছেছে। জীবাণু মুক্ত খাবার ব্যবস্থা আয়ু বাড়ার বড় একটা কারণ।

এর পরের আবিষ্কারটার পথ চেয়ে বসে আছি সাগ্রহে। সেদিন পুষ্টিকর বাতাস পুষ্টি জুগিয়ে যাবে অণুপরমাণুতে, কচমচ করে বর্বরদের মত আর খেতে হবে না—শুধু শ্বাস নিলেই চলবে।

'আর্থ হেরাল্ড'-এর বরেণ্য পরিচালকের একদিনের সমস্ত ঘটনা জানতে চান? তাহলে আজই চলুন তাঁর সঙ্গে।

আজ পঁচিশে জুলাই, ২৮৮৯ খৃষ্টাব্দ। শুধু আজকের দিনেই দেখুন কত বিভিন্ন মুখী কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন ফ্রান্সিস বেনেট।

গরম মেজাজ নিয়ে আজ ঘুম থেকে উঠছেন ভদ্রলোক। আট দিন হলো তাঁর বউ গেছেন ফ্রান্সে—বড় একা একা লাগছে তাঁর। দশ বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম এত দিনের জন্যে কাছ ছাড়া হয়েছেন অপরূপা সুন্দরী মিসেস এডিথ বেনেট। দু'তিন দিনের জন্যে অবশ্য প্রায়ই যান ইউরোপে, বিশেষ করে প্যারিসে, টুপি কিনতে।

ঘুম ভাঙতেই তাই ফোনোটেলিফোটের সুইচ অন করলেন ফ্রান্সিস। যন্ত্রের তার বিছানার পাশ থেকে চলে গেছে প্যারিসে, তাঁর নিজস্ব ভবনে।

টেলিফোটে আবিষ্কৃত হওয়ার পর টেলিফোনের ব্যবহার আর নেই। তড়িৎ শক্তির মাধ্যমে মুখের কথা দূর দূরান্তরে পাঠানো এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়, কিন্তু বক্তার ছবি পাঠানোর আবিষ্কারটা নতুন! বিপুল দূরত্বের ব্যবধানে বউকে টেলিফোটিক স্ক্রীনে পেয়ে গেলেন ফ্রান্সিস বেনেট।

অপূর্ব দৃশ্য। গতরাতে নিশ্চয় থিয়েটার অথবা নাচের আসরে গিয়েছিলেন মিসেস, তাই এত বেলাতেও ঘুমোচ্ছেন। প্যারিসে তখন দুপুর। বালিশে মাথা রাখার ভঙ্গিমা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখনও ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

কিন্তু ওই দেখুন একটু নড়ে উঠলেন···ঠোঁট নড়ছে···স্বপ্ন দেখছেন নিশ্চয়···হ্যাঁ, স্বপ্নই দেখছেন···একটা নাম উচ্চারিত হচ্ছে ঠোঁটের ফাঁকে···'ফ্রান্সিস···ডিয়ার ফ্রান্সিস।'

সুমধুর কণ্ঠে নিজের নাম শুনে মেজাজ ভাল হয়ে গেল ফ্রান্সিস বেনেটের। স্ত্রীর ঘুম না ভাঙিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন শয্যা থেকে, প্রবেশ করলেন যান্ত্রিক সাজ-ঘরে। দু'মিনিট পরেই বেরিয়ে এলেন সুসজ্জিত হয়ে। মেশিন তাঁকে মুখ ধুইয়ে, দাড়ি কামিয়ে, জুতো পরিয়ে, পোশাক পরিয়ে, প্রতিটি বোতাম এঁটে ফিটফাট করে দিয়েছে এই দু'মিনিটে। আজকাল চাকরের দরকারই হয় না।

শুরু হলো অফিসের প্রাত্যহিক কাজকর্ম।

প্রথমেই ঢুকলেন ধারাবাহিক ঔপন্যাসিকদের ঘরে।

ঘরটা বিরাট। মাথার ওপর বিরাট গম্বুজ। স্বচ্ছ, কিন্তু আলো আসতে পারে না। এক কোণে রয়েছে সারি সারি টেলিফোনিক যন্ত্র। আর্থ হেরাল্ডের একশো লেখক বসে একশোটা প্রেম কাহিনীর একশোটা অধ্যায় বর্ণনা করছেন উদ্বেলিত জনসাধারণকে।

ফ্রান্সিস বেনেট যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন পাঁচ মিনিটের বিশ্রাম নিচ্ছেন একজন লেখক। বেনেটের নজর পড়ল ঠিক তাঁর ওপরে। প্রশংসা করে বললেন, 'চমৎকার! সত্যিই আপনার শেষের অধ্যায়টা দারুণ। তরুণী পল্লীবালা তার মনের মানুষের কাছে অতীন্দ্রিয় দর্শনের সমস্যা যে ভাবে আলোচনা করে গেল, তার মধ্যে ছাপ রয়েছে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের! গাঁয়ের রীতিনীতির এত স্পষ্ট ছবি আর কখনও আঁকা হয়নি! চালিয়ে যান, মাই ডিয়ার আর্চিবল্ড, আরও খুলে যাক আপনার কপাল! গতকাল থেকেই দশ হাজার নতুন গ্রাহক বেড়েছে, ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ!'

আরেক লেখকের দিকে ফিরে বললেন, 'মিস্টার জন লাস্ট, আপনার ওপর কিন্তু আমি সন্তুষ্ট নই! প্রাণ নেই আপনার গল্পে। শেষে পৌঁছোনোর জন্যে বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করেন আপনি! দলিল দস্তাবেজের তো পাহাড় সাজিয়ে ফেলেছেন, এডিটিঙের ধার দিয়েও যাননি। কাজটা কিন্তু আপনারই! আজকালকার লেখকরা কলম দিয়ে লেখে না, স্ক্যালপেলের ধারাল ফলা দিয়ে লেখে, এও কি আপনাকে বারবার করে বলে দিতে হবে? জীবনের প্রতিটি কাজ অনেকগুলো ধাবমান চিন্তা-পরম্পরার ফলশ্রুতি। জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করতে হলে চিন্তাগুলোকে সাবধানে পর পর সাজানো দরকার নয় কি? ইলেকট্রিক্যাল হিপনোটিজমের সাহায্য নিলেই তো পারেন। দুটো ব্যক্তিত্বকে অতি সহজেই আলাদা ভাবে হাজির করা সম্ভব বৈদ্যুতিক সম্মোহনে! মাই ডিয়ার জন লাস্ট, নিজের দিকে একটু নজর রাখুন! এইমাত্র আপনার যে সতীর্থকে অভিনন্দন জানালাম, তাঁর কাজের ধারা অনুসরণ করুন! নিজে সম্মোহিত হয়ে যান...কি বললেন?...সে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন?...না, না, এখনও সন্তোষজনক হয়নি...আরও হওয়া দরকার।'

লেখকদের শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়ার পরেও ইন্সপেকশন চালিয়ে গেলেন ফ্রান্সিস বেনেট। তারপর ঢুকলেন সাংবাদিক ঘরে। পনেরোশো সাংবাদিক পনেরোশো টেলিফোনের সামনে বসে গত রাত ভূগোলক থেকে পৌঁছোনো খবরগুলো শুনিয়ে যাচ্ছে গ্রাহকদের।

অতুলনীয় এই সংবাদ সংগঠনের বর্ণনা এর আগেও দেয়া হয়েছে বেশ কয়েকবার। প্রত্যেক টেলিফোনের সামনে রয়েছে এক সারি কমিউটেটর! যখন যে টেলিফোটে লাইনের দরকার পড়ছে, তার সঙ্গে সংযোগ সাধন করে দিচ্ছে সেই কমিউটেটর। ফলে শুধু কান দিয়ে কাহিনীই শুনছে না গ্রাহক, চোখ দিয়ে দেখতেও পাচ্ছে সেই দৃশ্য। পাঁচমিশালী খবরগুলোর সার কথা শুনিয়ে দেয়া হচ্ছে এইভাবে। অতীতের ঘটনা ব্যাপক ফটোগ্রাফির ব্যবহারে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, যেন এখনই ঘটছে!

মহাকাশে সাম্প্রতিক কয়েকটা আবিষ্কারের পর থেকেই জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত খবরাখবরের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে। ফ্রান্সিস বেনেট তাই দশজন জ্যোতির্বিদ সাংবাদিকের একজনকে নিয়ে পড়লেন।

'কি হে, ক্যাশ, কি পেলে আজকে?'

'বুধ, শুক্র আর মঙ্গলের ফটোটেলিগ্রাম।'

'কৌতূহলোদ্দীপক?'

'মঙ্গলেরটা। হ্যাঁ! প্রজাতন্ত্রী সংরক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান বিপ্লব এনেছে কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যে।'

'ঠিক আমাদেরই মত! বৃহস্পতির খবর কী?'

'এখনও পর্যন্ত ভাল কিছু নেই! ওদের সিগন্যাল বুঝে উঠতে পারলাম না। হয়তো আমাদের সিগন্যাল ওদের কাছে

পৌঁছোয়নি...'

'ক্যাশ, সে দায়িত্ব তোমার।' অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ফ্রান্সিস বেনেট। এবার তিনি প্রবেশ করলেন বিজ্ঞানসম্মত সম্পাদকীয় ঘরে।

তিরিশজন পণ্ডিত তিরিশটা কমপিউটরের ওপর পিঠ ঠেকিয়ে পঁচানব্বইশো ডিগ্রীর সমীকরণ নিয়ে তন্ময় হয়ে বসে ছিলেন। বাচ্চা ছেলেরা যেমন সরল পাটিগণিতের চার নিময়বদ্ধ প্রাথমিক অঙ্ক কষে যায় ক্লাসে, ঠিক সেইভাবে কেউ কেউ বীজগাণিতিক অসীমত্ব অথবা চব্বিশতম স্থান মাত্রা কষে যাচ্ছেন আপনমনে। তিনটে ডাইমেনশনের পর টাইম ডাইমেনশনের হিসেব ছাড়িয়ে মানুষ আজ পৌঁছে গেছে চব্বিশতম ডাইমেনশনে!

বোমার মতই এঁদের মাঝে বিস্ফোরিত হলেন ফ্রান্সিস বেনেট।

'একি শুনছি আমি? বৃহস্পতি থেকে জবাব আসেনি?...বার বার একই কথা শুনতে হচ্ছে কেন আমাকে? কর্লি, আপনি তো বিশ বছর ধরে বৃহস্পতিকে খুঁচিয়ে চলেছেন...'

'আর কি আশা করেন আপনি?' বিনীত স্বরে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল একজন পণ্ডিত। 'আমাদের অপটিক্যাল সায়েন্সের আরও প্রগতি হওয়ার দরকার। দু'মাইল লম্বা টেলিস্কোপ নিয়েও আমরা...'

কর্লির পাশের পণ্ডিতের ওপর মনোযোগ দিলেন এবার ফ্রান্সিস বেনেট। 'পীয়ার, শুনছেন তো? চক্ষুসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের আরও প্রগতি দরকার! অপটিক্যাল সায়েন্সকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে!...চশমাটা চোখে পড়ুন! যে বিদ্যায় আপনি বিশেষজ্ঞ, সেই বিদ্যা কেন এখনও এত পিছিয়ে থাকবে?'

পীয়ারকে ছেড়ে আবার পাকড়াও করলেন তিনি কর্লিকে, 'বৃহস্পতি নিয়ে না হয় ব্যর্থ হয়েছেন, চাঁদের খবর কি?'

'এখনও কিছু পাইনি।'

'চমৎকার! এবার তো আর অপটিক্যাল সায়েন্সের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারবেন না! মঙ্গলের চেয়ে ছ'শ গুণ কাছে রয়েছে চাঁদ। তা সত্ত্বেও আমাদের সংবাদ বিভাগ যোগাযোগ রেখে যাচ্ছে মঙ্গলের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে। টেলিস্কোপের দরকার তো এখন হচ্ছে না...'

'না, না, সেসব নয়, এবার গণ্ডগোল পাকিয়েছে চাঁদের বাসিন্দারা।' পণ্ডিতসুলভ দুর্বোধ্য হাসি হেসে জবাব দিলেন কর্লি।

'তার মানে? আপনি কি বলতে চান চাঁদে লোক নেই বলে জবাব পাচ্ছেন না?'

'চাঁদের যে দিক আমাদের দিকে রয়েছে, সেদিকের কথা বলছি না। কিন্তু উল্টোদিকে কি আছে, তা তো জানা নেই।'

'সেটা জানা যায় অতি সোজা পন্থায়...'

'পন্থাটা কী বলবেন?'

'চাঁদকে ঘুরিয়ে দিন!'

সেইদিনই চন্দ্র উপগ্রহকে ঘুরিয়ে দেয়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল বেনেট কারখানায়। যান্ত্রিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের এলাহি কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গেলে আস্ত একটা বই লিখতে হবে বলে বিস্তারিত কিছু আর বললাম না।

সব মিলিয়ে সন্তুষ্টই হলেন ফ্রান্সিস বেনেট। নতুন গ্রহ 'গান্দিনী'র মূল তত্ত্ব এইমাত্র নির্ণয় করেছেন আর্থ হেরাল্ডের এক জ্যোতির্বিদ।

১২, ৮৪১, ৩৪৮, ২৮৪, ৬২৩ মিটার এবং ৭ ডেসিমিটার দূরত্বের এই গ্রহটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে ৫৭২ বছর, ১৯৪ দিন, ১২ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিট, ৯.৮ সেকেন্ডে।

নিখুঁত হিসেবটা শুনে পুলকিত হলেন ফ্রান্সিস বেনেট, বললেন, 'যান! এখুনি খবরটা দিন সাংবাদিকদের। এই ধরনের

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান শোনবার জন্যে পাগল আমার গ্রাহকরা। খবরটা যেন আজকের সংখ্যাতেই বেরিয়ে যায়!'

সাংবাদিক ঘর থেকে বেরোনোর আগে বিশেষ একদল সাংবাদিকের প্রতি মনোযোগ দিলেন বেনেট। এদের কাজ নামী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেয়া।

'প্রেসিডেন্ট উইলকক্সের ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে?'

'হয়েছে, মিস্টার বেনেট। সেই খবরই প্রকাশিত হচ্ছে এখন। ওঁর পাকস্থলী ফুলেছে, আন্ত্রিক ধোয়াধুয়ির কাজ চলছে এখন।'

'ভাল! গুপ্তঘাতক চ্যাপম্যানের সেই খবরটার কি হলো? জুরীদের ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছে?'

'হয়েছে। জুরীরা সবাই একমত হয়েছেন, চ্যাপম্যান সত্যিই অপরাধী। ফাঁসি তার হবেই।'

'বেশ!'

পরের ঘরটা সিকি মাইল চওড়া একটা গ্যালারি। পাবলিসিটি ঘর এটা। আর্থ হেরাল্ডের মত পত্রিকার প্রচার ব্যবস্থা কি রকম এলাহি তা কল্পনা করে নেয়া কঠিন নয়। রোজ গড়ে তিনকোটি ডলার ব্যয় করছে এই একটা ঘর।

প্রচার ব্যবস্থার বৈচিত্র্য চোখ কপালে তুলে দেয়ার মত। এখন যে পন্থায় প্রচার যন্ত্র চালু রয়েছে, তার মূল আবিষ্কারক মারা গেছেন অনাহারে। মাত্র তিন ডলারের বিনিময়ে তিনি স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন আর্থ হেরাল্ডকে। তিন ডলারে আর ক'দিন খাওয়া জোটে। তাই পটল তুলেছেন উদ্ভাবক। কিন্তু অভিনব সেই আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে আর্থ হেরাল্ড।

বিরাট বিরাট দানবিক আকৃতির চিহ্ন ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মেঘের গায়ে। এত বড় চিহ্ন যে দেশের যে কোন জায়গা থেকে দেখা যায় সুস্পষ্ট। গ্যালারি থেকে হাজার প্রোজেক্টরে নিক্ষিপ্ত

হচ্ছে বিজ্ঞাপন। মেঘের গায়ে ফুটে উঠছে সারি সারি রঙীন বিজ্ঞাপন, প্রায় নিখরচায়।

সেদিন কিন্তু ফ্রান্সিস বেনেট ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন কারিগররা হাত গুটিয়ে বসে আছে নিশ্চল প্রোজেক্টরগুলোর সামনে। কারণটা কি জানতে চাইলেন উনি। একযোগে সবাই হাত তুলে দেখাল নীল আকাশ…

'আচ্ছা! আবহাওয়া ভাল!' স্বগতোক্তি করলেন ফ্রান্সিস বেনেট, 'কিন্তু তাতে আমারই সর্বনাশ! আকাশ বিজ্ঞাপন কি তাহলে বন্ধ থাকবে? বৃষ্টি না হলে বিজ্ঞাপন চালিয়ে যেতে পারব না? বৃষ্টি হওয়া গোল্লায় যাক, আমি মেঘ চাই!'

প্রধান কারিগর বললেন, 'জ্বী, দরকার তুষারশুভ্র সফেদ মেঘ!'

বেনেট বললেন, 'মিস্টার সাইমন মার্ক, আপনি বরং এখনি যান আবহাওয়া বিভাগের সায়েন্টেফিক এডিটরদের কাছে। আমার নাম করে বলুন, নকল মেঘ তৈরির কাজ যেন এখুনি শুরু করে দেয়। চমৎকার আবহাওয়ার খেয়াল খুশির ওপর নির্ভর করে থাকলে ব্যবসা চলবে কিভাবে?'

বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন শেষে ফ্রান্সিস বেনেট এবার ঢুকলেন রিসেপশন হলে।

বিভিন্ন দেশের দূত আর মার্কিন সরকারের শীর্ষ স্থানীয় মন্ত্রীরা অপেক্ষা করে বসে আছে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে, তাঁর উপদেশ নিয়ে তাঁকে হাতে রাখার উদ্দেশ্যে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনলেন মান্যগণ্যদের তুমুল বাক্যযুদ্ধ।

রাশিয়ার দূতকে বিনীত স্বরে বললেন ফরাসি দূত, 'মাফ করবেন, কিন্তু ইউরোপের মানচিত্রের পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না আমার। উত্তর দিকটা স্লাভরা পাচ্ছে–মেনে নিলাম। কিন্তু দক্ষিণ দিকটা থাকছে ল্যাটিনদের।

রাইন নদী বরাবর আমাদের সবার সাধারণ সীমান্তরেখা যা আছে ঠিকই আছে। রোম, মাদ্রিদ আর ভিয়েনায় আমাদের ঘাঁটি আক্রান্ত হলে আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না। কথাটা খেয়াল রাখবেন!'

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ফ্রান্সিস বেনেট, 'বলেছেন চমৎকার!' রাশিয়ার দূতের দিকে চেয়ে বললেন, 'রাইন নদীর তীর থেকে চীনদেশের সীমান্ত পর্যন্ত এত বিরাট সাম্রাজ্যেও মন উঠছে না আপনাদের? সাম্রাজ্যটা কতবড় ভাবুন তো? বিশাল উপকূল ঘিরে রয়েছে আটলান্টিক, ভারত মহাসাগর, সুমেরু সাগর, কৃষ্ণ সাগর আর বসফরাস সাগর?

'তাছাড়া, ভয় দেখিয়ে লাভ কি বলতে পারেন? আমাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ কি সত্যি সম্ভব, বলুন? ষাট মাইল লম্বা ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশ দিয়ে চক্ষের নিমেষে তো গোটা একটা সৈন্যবাহিনীকে সাবাড় করে দেয়া যায় আজকাল, একশো মাইল দূর থেকে দম বন্ধ করার গোলা ছুঁড়লে স্রেফ অক্সিজেনের অভাবেই প্রাণ হারাবে কাতারে কাতারে মানুষ, এ ছাড়াও আছে গোলাভর্তি প্লেগ, কলেরা আর হলুদ জ্বরের জীবাণু। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এক একটা জাতি। যুদ্ধ কি আর সম্ভব?'

রাশিয়ার দূত আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'সবই জানি মিস্টার বেনেট, কিন্তু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার স্বাধীনতা তো আমাদের আছে, কি বলেন?...পুব সীমান্তে চীনেম্যানদের তাড়া খেয়ে যদি পিছু হটতে হয়, পশ্চিমসীমান্তে কিছু জায়গা তো দখল করতেই হবে...'

'ব্যস, ব্যস, আর বলবেন না,' সান্ত্বনার সুরেই বললেন ফ্রান্সিস বেনেট, 'চীনদেশের লোক সংখ্যা বাড়তে বাড়তে সারা পৃথিবীর বিপদ ডেকে আনছে দেখা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করতে হবে ওদের ওপর। জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে তাদের।

সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলে সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড! তাতেই বজায় থাকবে ভারসাম্য।'

রাশিয়া আর ফ্রান্সকে এইভাবে ঠাণ্ডা করে ইংরেজ দূতকে নিয়ে পড়লেন আর্থ হেরাল্ডের ডিরেক্টর, 'বলুন স্যার, কি সেবায় লাগতে পারি আপনার?'

'অনেক কিছুই করতে পারেন মিস্টার বেনেট। আমাদের তরফে একটা প্রচার এখুনি শুরু করতে পারেন...'

'কি উদ্দেশ্যে?'

'যুক্তরাষ্ট্র যাতে গ্রেট বৃটেনকে লাগোয়া রাজ্য বানাতে না পারে। একটা প্রতিবাদলিপি প্রচার করা খুবই দরকার।'

'ব্যস, এইটুকুই শুধু চান?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন ফ্রান্সিস বেনেট। 'গ্রেট বৃটেন তো যুক্তরাষ্ট্রের লাগোয়া রাজ্য হয়েই রয়েছে দেড়শো বছর ধরে! ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়েই ইংরেজদের দেশ আজকে আমেরিকান কলোনি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সহজ এই সত্যটা আপনারা ইংরেজরা কেন মাথায় ঢোকাতে পারছেন না বুঝি না! পাগলামির একটা সীমা থাকা দরকার। আপনার দেশের সরকারের দুরাশা দেখে অবাকই লাগছে! নিজের দেশের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলনে আমি নামব, এমন আশা তাঁরা করেন কি করে?'

'মিস্টার বেনেট, মন্‌রো নীতি অনুযায়ী আমেরিকা শুধু আমেরিকানদের জন্যেই, তার বেশি কিছুই আর প্রাপ্য নয় আমেরিকানদের। তাছাড়া...'

'কিন্তু ইংল্যান্ড আমাদের একটা কলোনি। অত্যন্ত ভাল কলোনি। এমন একটা কলোনি আমরা আমেরিকানরা হাতছাড়া করব, ভাবেন কি করে?'

'আপনি তাহলে আমাদের পক্ষে প্রচারে যেতে রাজি নন?'

'একেবারেই না। যদি বেশি পীড়াপীড়ি করেন, তাহলে আজকের সব কথাই ফাঁস করে দেব আর্থ হেরাল্ডে। সাক্ষাৎকারটা হয়েছে আমারই এক রিপোর্টারের সঙ্গে, সবাই তাই জানবে।'

দম ফুরিয়ে গেল বৃটিশ দূতের, স্বর নামিয়ে বললেন, 'তাহলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ইউনাইটেড কিংডম, কানাডা আর নিউ বৃটেন দখলে রইল আমেরিকানদের, ইন্ডিয়া রইল রাশিয়ানদের দখলে, স্বাধীন রইল কেবল অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড! ইংল্যান্ড বলতে এককালে যা বোঝাতো তার আর কিছুই রইল না।' হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন তিনি। 'কিসসু রইল না!'

বেনেট খোঁচা মারলেন, 'একেবারেই কি কিছু রইল না? জিব্রাল্টারকে মনে পড়ছে না?'

ঠিক এই সময়ে বারোটার ঘণ্টা বাজল ঘড়িতে। হাতের ইশারায় দর্শনপ্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের সমাপ্তি জানিয়ে আর্থ হেরাল্ডের মহামান্য ডিরেক্টর এবার গিয়ে বসলেন চলমান চেয়ারে। মিনিট কয়েকের মধ্যে চাকাওয়ালা চেয়ার পৌঁছে গেল খাবার ঘরে, আধমাইল দূরে অফিসের দূরতম প্রান্তে।

টেবিল সাজানোই ছিল, উনি গিয়ে বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে। হাতের কাছে এগিয়ে দেয়া হয়েছে সারি সারি পানির কলের মতো কল। সামনেই রয়েছে ফোনোটেলিফোটের বাঁকানো পর্দা। পর্দার বুকে দেখা যাচ্ছে তাঁর প্যারিসের ভবনের খাবার ঘর। একই সময়ে খেতে বসার পরিকল্পনা করেছিলেন স্বামী-স্ত্রী। দূরত্ব বিপুল হওয়া সত্ত্বেও ফোনোটেলিফোটে যন্ত্রের কারণে সামনাসামনি 'বসে' খেতে খেতে গল্প করা কোন ব্যাপারই নয়!

কিন্তু প্যারিসে খাবার ঘরে কেউ নেই।

বিরক্ত হয়ে স্বগতোক্তি করলেন বেনেট সাহেব, 'আহ,

মেয়েদের সময় জ্ঞান কবে ঠিক হবে জানি না। সব কিছুরই প্রগতি হচ্ছে, মেয়েদের সময় জ্ঞান ছাড়া।'

সময় কাটাতে কলগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন বেনেট। ঘুরিয়ে দিলেন একটা কল।

সব বাড়িতেই যে সুবিধে পৌঁছে গেছে, বেনেট সাহেবও তার সুযোগ নিয়েছেন। বাড়ি থেকে তুলে দিয়েছেন রান্নাবান্নার পাট। সদস্য হয়েছেন খাদ্য সরবরাহকারী একটা সমিতির। বায়ুচালিত নলের মধ্যে দিয়ে হাজার রকমের খাদ্য সরবরাহ করে এই সমিতি। ব্যবস্থাটা ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নেই। কিন্তু খাবারের মান ভাল। তাছাড়া এর ফলে বাবুর্চি আর কাজের মেয়েদের ভয়াবহ দাপটও কমেছে। এখন ওসব পেশায় লোক নেই বললেই চলে।

খিদে লেগেছে খুব, নিশ্চিন্ত মনে নিবিবিলিতে লাঞ্চ শুরু করলেন বেনেট। বেশিকিছু খান না তিনি। একটু পরই কফিতে চুমুক দিয়ে উঠে পড়বেন কিনা ভাবছেন, এমন সময়ে টেলিফোটে স্ক্রীনে দেখা দিলেন মিসেস বেনেট।

রেগে ছিলেন, জানতে চাইলেন বেনেট, 'এডিথ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'একী! তোমার খাওয়া শেষ! নিশ্চয় দেরি করে ফেলেছি আমি, তাই না!' নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলাম বলো তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে···টুপি কিনতে···এ বছর যা সব টুপি বানিয়েছে না, পরলে মাথা ঘুরে যাবে তোমার। টুপি তো নয়, গম্বুজ, ছাউনি···সে যে কত রকমের! অত ডিজাইন মনেই রাখা যায় না!'

'সময়ের হিসেবটাও মনে নেই তোমার,' বললেন অসন্তুষ্ট বেনেট। 'আমার খাওয়া তো শেষ!'

'তবে দৌড়োও, কাজের স্রোতে ভেসে যাও! আমারও একটা

কাজ বাকি এখনও···জিমনের্নো-য়ামে যেতে হবে!'

মেয়েদের জিমনেশিয়াম যে আসলে কি, তা জনৈক পুরুষের মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। তিনি বলেছিলেন; 'মেয়ে মানুষ বলতে বোঝায় কেবল দৈহিক- গড়ন পেটন!' সুতরাং অপরূপা সুন্দরী মিসেস বেনেট তাঁর শরীর ঠিক রাখার জন্যে যে প্যারিসে ছুটবেন, এ খুবই স্বাভাবিক!

হাতের ইশারায় বিদায় জানিয়ে বেনেট উঠে এলেন জানালার সামনে। অ্যারো-কার দাঁড়িয়ে বাইরে।

তাঁকে চুপ করে তাকাতে দেখে অ্যারো-কারের ড্রাইভার আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, কোথায় যাব বলুন?'

তার দিকে মনোযোগ দিলেন বেনেট। 'দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি।' ঘড়ি দেখলেন। হাতে এখনও সময় আছে। 'নায়াগ্রায় চলো, আমার অ্যাকুমুলেটর ফ্যাক্টরিটা দেখে আসা দরকার।'

বাতাসের চাইতে ভারী অ্যারো-কার ঘণ্টায় চারশো মাইল বেগে ছুটে চলল বাতাস কেটে। নিচে দেখা যাচ্ছে শহরের বুকে চলমান ফুটপাথ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে পথচারীরা। শহরতলিগুলোয় মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ইলেকট্রিক তার। নানা কাজে নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে চলেছে ওগুলো।

আধঘণ্টা লাগল নায়াগ্রায় পৌঁছতে। নেমে গেলেন মিস্টার বেনেট।

জলপ্রপাতের বিপুল পরিমাণ পানি থেকে শক্তি উৎপাদন করে ঘরে ঘরে বিক্রি করেন তিনি, কারখানায় কারখানায় ভাড়াও দেন। ফ্যাক্টরি ঠিক মতো চলছে তা নিশ্চিত হয়ে ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, নিউ ইয়র্ক হয়ে পৌঁছোলেন তিনি সেন্ট্রোপলিসে। ঠিক পাঁচটার সময়ে নামলেন অ্যারো-কার থেকে।

আর্থ-হেরাল্ডের ওয়েটিং রুমে গিজগিজ করছে লোক। দরখাস্ত কারীদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে কয়েকজনের সঙ্গে বড়জোর দেখা করবেন তিনি। গণসংযোগ। রোজই তিনি দেখা দেন এইভাবে। দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে থাকে রাজধানীর নামী উদ্ভাবকরা, নতুন কোম্পানী করতে উৎসাহী উদ্যোক্তারা। সবার কথা শুনতে হয় তাঁকে। বেছে নেন যেটা ভাল, বাতিল করেন যেটা খারাপ, চিন্তা করেন যেটার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। ঝুঁকিও চাই। নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝুঁকি নিতে ভালবাসেন বেনেট।

অবাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে যারা এসেছে, তাদের বিদেয় করলেন দু'চার কথায়। এদের মধ্যে একজন এসেছিল লুপ্ত তৈলচিত্র অঙ্কনশিল্পকে আগের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়ে। জাপানী কালার ফটোগ্রাফির দৌরাত্ম্যে তৈলচিত্র তার কদর হারিয়েছে। খুবই ভাল একটা পেইন্টিং বিক্রি হয়েছে মাত্র পনেরো ফ্রাঙ্কে। আর একজন এসেছিল বায়োজিনি ব্যাসিলাস সম্পর্কে কথা বলতে। মানুষের দেহে এই ব্যাসিলাস ঢুকিয়ে দিলে নশ্বর মানুষ নাকি অমরত্ব লাভ করবে। আর একজন কেমিস্ট 'নিহিলিয়াম' নামে এমন একটা নতুন পদার্থ তৈরি করতে চায় যার প্রতি গ্রামের দাম মোটে তিরিশ লক্ষ ডলার। একজন ডাক্তার এনেছিল দুর্দান্ত একটা আবিষ্কারের পরিকল্পনা। মাথায় সর্দি বসলে সারিয়ে দেয়ার মোক্ষম ওষুধ।

সব স্বপ্নই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বেনেট সাহেবের অঙ্গুলি হেলনে।

কয়েকজন অবশ্য এর চাইতে ভাল সমাদর পেল তাঁর কাছে। এদের মধ্যে একজন ছিল বুদ্ধিদীপ্ত এক সুদর্শন তরুণ। উঁচু-চওড়া কপাল দেখেই বোঝা যায় সে তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী।

তার বক্তব্য এই, 'স্যার, মৌলিক পদার্থের সংখ্যা পঁচাত্তর

থেকে কমে তিনে দাঁড়িয়েছে, আপনি নিশ্চয় তা জানেন।'

'খুব ভাল করেই জানি,' জবাব দিলেন ফ্রান্সিস বেনেট।

'তিনকে কমিয়ে এক-এ দাঁড় করাতে চাই আমি। হাতে টাকা থাকলে সফল হব তিন সপ্তাহেই।'

'তারপর?'

'তারপর পাব সত্যিকারের পরম, মানে, অ্যাবসলিউট।'

'আবিষ্কারের ফলাফলটা কি হবে?'

'যাবতীয় বস্তুই উৎপাদন করা তখন ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়াবে। পাথর, কাঠ, ধাতু, তন্তু...'

'মানুষ তৈরি পর্যন্ত?'

'পুরোপুরি। বাকি থাকবে কেবল আত্মা!'

'কেবল আত্মা!' বিদ্রূপাত্মক প্রতিধ্বনি তুললেন বেনেট। তুললেন বটে, কিন্তু তরুণ ছেলেটিকে পাঠালেনও আর্থ হেরাল্ডের সায়েন্টিফিক এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্টে।

বিস্ময়কর একটা পরিকল্পনা নিয়ে এলেন এক উদ্ভাবক। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটা পুরোনো এক্সপেরিমেন্টের ভিত্তিতে খাসা আইডিয়া এসেছে তাঁর মাথায়। গোটা একটা শহরকে তিনি চালিয়ে নিয়ে যাবেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। যেমন, সাফ নগরী এখন রয়েছে সমুদ্র থেকে পনেরো মাইল দূরে। রেইল লাইনের ওপর দিয়ে শহরটাকে নিয়ে যাবেন সমুদ্র সৈকতে, আগে থেকেই তৈরি করা জমির ওপর। তারপর জমি আরও বাড়িয়ে নেবেন, ফলে চমৎকার সমুদ্র নিবাস হয়ে দাঁড়াবে শহরটা। জমির দাম হু-হু করে বেড়ে যাবে। বাড়তেই থাকবে।

আইডিয়াটা ভাল লাগল ফ্রান্সিস বেনেটের। অর্ধেক শেয়ার নিতে রাজী হলেন তিনি।

তৃতীয় উদ্ভাবক তাঁর পালা এলে বললেন, 'স্যার, আপনার

সৌর আর ভূ ট্র্যান্সফর্মার অ্যাকুমুলেটর ব্যবহার করে সব ঋতুই এক রকম করে ফেলেছি আমরা; শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষার বাড়াবাড়ি আর কোথাও নেই। আমি এবার আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে চাই। শক্তির মধ্যে উত্তাপের যে অংশ আমাদের হাতের নাগালে রয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে মেরু অঞ্চলের বরফ গলিয়ে দিতে চাই।'

ভেবে দেখতে হবে। সময় দরকার। 'পরিকল্পনা রেখে যান, এক হপ্তা পরে আসবেন,' বললেন বেনেট।

সবচেয়ে চমকপ্রদ সংবাদটা হাজির করলেন চতুর্থ উদ্ভাবক। জানালেন যে রহস্যের সমাধান হয়নি, সেই রহস্যেরই সমাধান হবে আজ সন্ধেয়।

রহস্যটা সবাই জানেন। একশো বছর আগের কথা। দুঃসাহসী আবিষ্কারক ডক্টর নাথানিয়েল ফেথবার্ন গোটা পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর পরিকল্পনা প্রচার করে। জড়ভাবে ঘুমিয়ে নিষ্ক্রিয় ভাবে শীত কাটিয়ে দেয়ার নাম হাইবারনেশন। সাপের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়। ভালুকের ক্ষেত্রেও। অনেক প্রাণীই এই কৌশল কাজে লাগায়। উনি চেয়েছিলেন মানুষের ক্ষেত্রেও হাইবারনেশন চালু করা হোক। প্রক্রিয়াটা নিজের ওপরেই প্রয়োগ করেছিলেন ডক্টর ফেথবার্ন। নিজের হাতে উইল লিখে গিয়েছিলেন একশো বছর পরে কিভাবে তাঁর দেহে প্রাণের সঞ্চার করা হবে।

শুন্যাঙ্কের নিচে ১৭২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, মানে, ২৭৮ ডিগ্রী ফারেনহাইটে সমাহিত করেছিলেন নিজেকে। ফলে, মমিতে পরিণত হয়েছিল তাঁর দেহ। সেই অবস্থায় একশো বছরের জন্যে তাঁর দেহ রাখা হয়েছিল ল্যাবোরেটরিতে।

আজ সেইদিন এসেছে। আজকে মহান বিজ্ঞানীর জাগরণের

দিন। ২৮৮৯ সালের ২৫ শে জুলাই তাঁর দেহে প্রাণ সঞ্চার করার কথা। এইমাত্র সনির্বন্ধ অনুরোধ এসেছে ফ্রান্সিস বেনেটের কাছে আশ্চর্য সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্যে। বিজ্ঞানীর সংজ্ঞা ফেরার আশায় অধীর প্রতীক্ষায় সাগ্রহে বসে আছেন বিজ্ঞানীরা আর্থ হেরাল্ডেরই একটি ঘরে। পত্রিকা মারফত প্রতি সেকেন্ডের ঘটনাবলী জানতে পারবে জনসাধারণ।

উদ্ভাবক বিজ্ঞানীদের প্রতিনিধি। তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বেনেট।

রাত দশটায় জেগে ওঠার কথা ডক্টর ফেথবার্নের। হাতে অনেক সময়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে। বসার ঘরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বোতাম টিপে সেন্ট্রাল কনসার্ট শুনতে লাগলেন বেনেট।

সারাদিনের ছুটোছুটির পর অপূর্ব সুর তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে দিল। সে কালের অগাণিতিক গানবাজনার যুগ এখন ফুরিয়েছে, কারও তা অজানা নয়। এযুগের সুর ও সঙ্গীত ভাল লাগতে বাধ্য। সুর ও গানের সুরসপ্তক আজকাল বাঁধা হয় বীজগণিতের ফরমুলায়!

আরামপ্রদ চমৎকার ঘরের আবছা আলোয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন বেনেট। হঠাৎ খুলে গেল একটি দরজা।

একটা বোতাম টিপলেন বেনেট। 'কে ওখানে?' সঙ্গে সঙ্গে ইথারের ওপর বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাতাস। 'তাই বলুন, ডাক্তার!'

ডক্টর স্যাম এসেছেন দেখা করতে। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার ভিত্তিতে নিয়মিত চেকআপ করে যান তিনি বেনেটকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ, আমি। আজ আছেন কি রকম?'

'ভাল!'

'তবুও জিভটা দেখান।'

মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বেনেটের জিভ দেখলেন ডাক্তার।

'ভালোই আছে।...পাল্‌স্‌?' পাল্‌সোগ্রাফ বের করে ফেললেন ডাক্তার। হাত দিয়ে পাল্‌স্‌ দেখার দিন শেষ, আজকাল পাল্‌স্‌ দেখা হয় যন্ত্রে। যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা ভূকম্পন দেখার যন্ত্রের মত।

'চমৎকার!...খিদে কিরকম?'

'মোটামুটি!'

'দেখি পাকস্থলীটা!...উঁহুঁ, পাকস্থলী তো ঠিক মতো চলছে না। পুরোনো হয়ে এল তো, পালটে নিন। নতুন পাকস্থলী লাগান!'

'সে পরে হবে,' বললেন বেনেট, 'আপাতত আপনার পাকস্থলীটা ভরিয়ে নিন আমার খাবার টেবিলে। আসুন, একসঙ্গে খাওয়া যাক।'

খাবার টেবিলে আড্ডা জমে উঠল ফোনোটেলিফোটিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে। মিসেস বেনেট এবার আর দেরি করেননি। প্যারিসের খাবার ঘরে ঠিক সময়ে তিনি উপস্থিত। হাসতে হাসতে তাঁর পেট ব্যথা হয়ে গেল ডাক্তারের ঠাট্টাতামাসায়। খাওয়া শেষ হতেই বেনেট জানতে চাইলেন, 'এডিথ, সেন্ট্রোপলিসে আসছ কবে?'

'এখুনি রওনা হচ্ছি।'

'টিউবে, না, অ্যারো-ট্রেনে?'

'টিউবে।'

'কখন পৌঁছাচ্ছো?'

'রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে।'

'প্যারিস সময়?'

'না, সেন্ট্রোপলিস সময়।

'গুডবাই।...টিউব যেন মিস্ কোরো না!'

অ্যারো-ট্রেনের চাইতে গতি অনেক বেশি এই টিউবের। প্যারিস থেকে সেন্ট্রোপলিস পৌঁছে যায় মাত্র ২৯৫ মিনিটে। ছোটে ঘণ্টায় ছশো মাইল বেগে।

ফেথবার্নের ঘুম ভাঙার আগেই ফিরে আসবেন কথা দিয়ে বিদায় নিলেন ডাক্তার।

বেনেট গেলেন তাঁর প্রাইভেট অফিসে। সারাদিন যা আয় হয়েছে তার হিসেব নেবেন। নিজেই তিনি হিসেব বুঝে নেন। রোজ আটলক্ষ ডলার বড় কম কথা নয়! কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতির কারণে কাজটা তাঁর কাছে কয়েক মিনিটের ব্যাপার। পিয়ানো ইলেকট্রিক কমপিউটরের সাহায্যে দেখতে দেখতে হিসেব শেষ করে ফেললেন বেনেট।

ক্যালকুলেটরের শেষ বোতামটা টেপা হতেই ডাক পড়ল এক্সপেরিমেন্ট ঘরে। সময় হয়ে এসেছে ফেথবার্নের জাগরণের।

দেরি না করে এক্সপেরিমেন্ট দেখতে হাজির হলেন বেনেট। দেখলেন, ঘর ভরে গেছে বিজ্ঞানীদের ভিড়ে। এদের মাঝে ডাক্তার স্যামও আছেন।

ঘরের মাঝখানে কফিনে শোয়ানো রয়েছে নাথানিয়েল ফেথবার্নের দেহ।

সুইচ অন করে দেয়া হলো টেলিফোটের। সারা পৃথিবী এবার দেখুক ধাপে ধাপে কিভাবে পুনর্জাগরণ ঘটে একশো বছর আগে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া দেহটার।

খোলা হলো কফিন। বের করে আনা হলো ফেথবার্নের দেহ। শুকনো একটা দেহ। হলদে বর্ণের। শক্ত। দেখে মনে হচ্ছে কাঠের দেহ।

গরম করা হলো ফেথবার্নকে। সঞ্চালন করা হলো বিদ্যুৎ।

নিষ্ফল হলো দুটো প্রক্রিয়াই। এবার সম্মোহন করা হলো। নানারকম সাজেশন দেয়া হলো সম্মোহনের মাধ্যমে, কিন্তু কিছুতেই গতি সঞ্চার করা গেল না শুকনো দেহটাতে।

'কি মনে হয়, ডক্টর স্যাম?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন বেনেট।

ঝুঁকে পড়লেন ডাক্তার। আপাদমস্তক পরীক্ষা করলেন বিজ্ঞানীর দেহ। সিরিঞ্জে করে শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন বিখ্যাত ব্রাউন সিকোয়ার্ড। বলা হয় এটি সব অসুখের ওষুধ। নতুন করে এ অষুধ আবার চালু হয়েছে এ যুগে। কিন্তু শুকনো দেহ আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল ইঞ্জেকশনের পর।

'বড় বেশি হাইবারনেশন হয়ে গেছে দেখছি,' মন্তব্য করলেন ডাক্তার।

'আচ্ছা।'

'নাথানিয়েল ফেথবার্ন আর বেঁচে নেই।'

'মৃত!'

'একেবারে।'

'কত বছর আগে মারা গেছেন?'

'কত বছর আগে? একশো বছর তো বটেই। বিজ্ঞানের স্বার্থে ঠাণ্ডায় নিজেকে জমাতে চেয়েছিলেন, তাই হয়েছে। একশো বছর আগেই জমে মরেছেন তিনি।'

'তাহলে পদ্ধতিটাকে আরও নিখুঁত করা দরকার!' শেষ মন্তব্য করলেন বেনেট।

'হ্যাঁ, নিখুঁত করাই দরকার,' সায় দিলেন ডাক্তার।

কফিন নিয়ে চলে গেলেন হতাশ বিজ্ঞানীরা।

*

ডাক্তারের সঙ্গে অফিস ঘরে ফিরে এলেন বেনেট। সারাদিনের

এত ধকলের পর বিশ্রাম দরকার। তার আগে গোসল করার পরামর্শ দিলেন ডাক্তার।

খুশি মনে রাজি হলেন বেনেট। গোসল না করলে শরীর আসলেই ঝরঝরে হবে না।

'তাহলে বলে দিই গোসলের আয়োজন করতে?' বললেন ডাক্তার।

'তার দরকার হবে না, ডাক্তার। ব্যবস্থা আমার অফিস ঘরেই থাকে। ঘরে গিয়ে গোসল করার দরকার হয় না। এই দেখুন, এই বোতামটা টিপলেই বাথটাব চলে আসবে আমার কাছে। পঁয়ষট্টি ডিগ্রী উষ্ণতায় থাকবে পানি সবসময় !'

সুইচ টিপলেন ফ্রান্সিস বেনেট। অনেকদূরে গুড়গুড় শব্দ শোনা গেল। দ্রুত এগিয়ে আসছে। আসছে আরও কাছে। আওয়াজ বাড়ছে। আরও বাড়ল। আচমকা খুলে গেল দরজা। রেইল লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মসৃণ গতিতে ঘরে ঢুকল একটা বাথটাব।

যেই ঘরে ঢুকল ওটা, অমনি নারী কণ্ঠের সলজ্জ চিৎকারে ভরে উঠল ঘর। চোখে হাত চাপা দিয়ে ভেগে গেলেন ডাক্তার।

আধঘণ্টা আগে টিউবের মধ্যে দিয়ে আটলান্টিক পেরিয়ে এসে বাথটাবে বসে বসে ক্লান্তি দূর করছিলেন মিসেস বেনেট।

*

পরের দিন ২২৮৯ খৃষ্টাব্দের ছাব্বিশে জুলাই আর্থ হেরাল্ডের ডিরেক্টর আবার শুরু করলেন তাঁর বারো মাইল ব্যাপী অফিস পরিভ্রমণ। রাতে হিসেব শেষে দেখা গেল সারা দিনে যা রোজগার হয়েছে, তা আগের দিনের চাইতে পঞ্চাশ হাজার ডলার বেশি।

পাঠক, ঊনত্রিংশ শতাব্দীর শেষে এর চাইতে ভাল আর কি করতে পারেন একজন সাংবাদিক?

ফ্রিৎ-ফ্ল্যাক্

এক

ফ্রিৎ!

বাড়ছে, হাওয়ার বেগ বাড়ছে!

ফ্ল্যাক! অর্থাৎ বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে!

ঝড় আর বৃষ্টির দাপটে কাছের পাহাড়ের গাছগুলো মাথা নোয়াচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে ফুঁসে উঠে ক্রিমা-র পর্বতমালার গায়ে আছড়ে পড়ছে দুরন্ত পাগলা ঝড় আর দামাল বৃষ্টি।

বিপুল সাগর মেগালোক্রাইডের দীর্ঘ উপকূল বরাবর খাড়া পাহাড়গুলোর গায়ে বিরামবিহীন ভাবে দাঁত বসিয়ে যাচ্ছে তুমুল ঝঞ্ঝা আর একটানা ভারী বর্ষণ।

ফ্রিৎ! ফ্ল্যাক্! ঝড় আর বৃষ্টি!

আজকে একই সঙ্গে শুরু হয়েছে ঝড় আর বৃষ্টির দাপাদাপি।

পেছনে বেশ দূরে একটা বন্দর। সেটার গায়ে ছোট্ট শহর লাক-ট্রপ। কয়েকশো বাড়ির সবুজাভ বারান্দাগুলো বৃথা চেষ্টা করছে সমুদ্র হতে তেড়ে আসা ঝড়-বৃষ্টির হামলা থেকে বাড়িগুলোকে রক্ষা করার।

শহরের চার-পাঁচটা রাস্তায় ছাই জমেছে পুরু হয়ে। এ-ছাই এসেছে আগ্নেয়গিরি থেকে। বেশি দূরে নয় ওটা শহর থেকে। নাম তার ভ্যাঙ্গলর। চূড়ো থেকে ভলকে ভলকে বেরুচ্ছে আগুন আর ছাই। দিনের বেলায় তার গভীর গর্ত থেকে নিক্ষিপ্ত হয় ধুলোর মেঘ। গন্ধকের ধোঁয়ায় ঢেকে দেয় চারদিক। আর রাতে

মিনিটে মিনিটে করে আগুন বমি।

মাত্র পাঁচশো কার্টসেস্ দূরে একটা বিরাট লাইট হাউস। লাক-ট্রপ বন্দরের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে দূর সমুদ্রযাত্রীদের কাছে। মেগালোক্রাইডের উত্তাল পানিতে যারা নৌকো নিয়ে বেরোয়, তাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে রাতে। সাবধান! সাবধান! আমি এখানে! আমাকে দেখো!

শহরের রাস্তাঘাট এমনিতেই বাজে। রাস্তা না বলে গলি ঘুঁজি অথবা পাহাড়ি পথ বলাই সমীচিন হবে। উঁচুনিচু শিড়দাঁড়া যেন। ঢিবিঢিবি পাথর দিয়ে বাঁধানো। তার ওপর পুরু ছাই জমে অবস্থা আরও জঘন্য করে তুলেছে।

বিচ্ছিরি শহরটার দূর প্রান্তে একটা ধ্বংসাবশেষ আছে। ক্রিমেরিয়ান যুগের ভগ্নস্তূপ। তারপরেই একটা অদ্ভুত শহরতলি। দেখলে মনে হয় আরব্য ছাঁদে তৈরি।

সাদা দেয়ালওয়ালা একটা কসবা আছে। উত্তর আফ্রিকা, বিশেষ করে আলজিয়ার্সে এ ধরনের কেল্লা দেখা যায়। রৌদ্রদগ্ধ ছাদের ওপর গম্বুজের পর গম্বুজ। জমিনে রাশিরাশি ঘনক-স্তূপ বিক্ষিপ্ত পড়ে রয়েছে এলোমেলো ভাবে। একেকটা নিরেট ঘনকের ছদিকে ছটি সমান আকারের চতুর্ভুজ। দেখলে মনে হয় লুডো খেলার ছক্কা। রাশি রাশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা শহরতলিতে। বাতাস ঝড় বৃষ্টির নিয়ত অত্যাচারে প্রতিটি ছক্কার কোণগুলো ক্ষয়ে গোল হয়ে এসেছে।

অদ্ভুত এই পাড়াগাঁয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে অদ্ভুত একটা চারকোনা বাড়ি। বাড়িটার নাম ছয়-চার। কারণ, এর একদিকে ছ'টা জানালা আর দরজা, আরেকদিকে দরজা জানালার সংখ্যা চার।

পল্লীর মাথা ছাড়িয়ে আকাশমুখো হয়ে আছে একটা বিশাল

ঘণ্টাঘর।

সেন্ট ফিলফেলেনের চৌকোনা ঘণ্টাঘর। বহু দেয়ালের আলিঙ্গনে আড়ষ্ট হয়ে ঝুলছে ঘণ্টাগুলো। মাঝে মাঝে মত্ত হাওয়ার দোলায় ঢন্-ঢনাঢন্ ঢন্-ঢনাঢন্ করে বাজতে শুরু করে সবক'টা ঘণ্টা। আওয়াজের সমষ্টি বিদঘুটে শোনায়। গা ছম ছম করতে থাকে শহর আর শহরতলির মানুষের।

এই হলো লাক-ট্রপ শহরের আকৃতি এবং চরিত্র। মরাটে শহর। পোড়ো শহর।

বাড়ির সারির পরেই গ্রামাঞ্চলের বিক্ষিপ্ত কুঁড়েঘর। ঝোপঝাড়, জলা, পুকুর এখানে একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

এ একই দৃশ্য দেখা যায় বৃটেনে। লাক-ট্রপ কিন্তু বৃটেনের শহর নয়।

ফ্রান্সে?

জানা নেই আমার।

তবে কি ইউরোপে?

বলতে পারব না।

শুধু বলব, ম্যাপে খুঁজতে যাবেন না লাক-ট্রপকে, বৃথা খাটনি হবে। অত্যাধুনিক অ্যাটলাসেও সন্ধান পাবেন না আজব এই শহরের।

দুই

ফ্রক!

অর্থাৎ দরজায় টোকার শব্দ।

কে যেন সজোরে আঙুলের গাঁট ঠুকে চলেছে ছয়-চার

বাড়িটার সরু সদর দরজায়।

মেস্যাগ্নিয়েরে স্ট্রীটের বাঁদিকের কোণে রয়েছে অদ্ভুত এই ছয়-চার বাড়িটা। অদ্ভুত হলেও গোটা লাক-ট্রপ শহর খুঁজেও এমন আরামপ্রদ বাড়ি আরেকটি পাওয়া যাবে না।

তবে হ্যাঁ, আরামপ্রদ শব্দটা এ শহরের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য হবে কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়। শহরবাসী মাত্র কয়েক হাজার হলেও তারা বেশ বড়লোক। এই বিচারে শহরটাকে সমৃদ্ধ শহর বলা যেতে পারে; অন্তত লাক-ট্রপের সীমিত ঐশ্বর্যের মাপ কাঠিতে।

আঙুল ঠোকার প্রত্যুত্তর এল নেকড়ের হুঙ্কারের মতো কুকুরের গর্জনে। গুরুগম্ভীর গলায় গর্জে উঠল একটা কুকুর। নিঝুম রাত যেন শিহরিত হলো একটানা সেই গর্জনে। বুনো বর্বর ক্ষুধার্ত নেকড়ের গলায় শোনা যায় এমন রক্ত হিম করা হুঙ্কার।

হুঙ্কার থামার সঙ্গে সঙ্গেই ছয়-চার বাড়ির সদর দরজার ঠিক মাথায় দড়াম করে খুলে গেল একটা কাঁচের জানালা।

কুকুরের গর্জনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে খেঁকিয়ে উঠল একটা বদমেজাজী কণ্ঠস্বর, 'ভিখিরিগুলোকে শয়তান ডেকে নেয় না কেন বুঝি না!'

শতচ্ছিন্ন বর্ষাতি গায়ে একটি মেয়ে ঠক্ টক্ করে কাঁপছে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে। করুণ স্বরে বলল, 'ডাক্তার ত্রিফাল্‌গাস কি আছেন?'

'আছেনও, আবার নেইও। থাকা না থাকা নির্ভর করছে তাঁর ইচ্ছের ওপর!'

'বাবা খুব অসুস্থ, তাই এসেছি!'

'একেবারে কৃতজ্ঞ করে দিয়েছ! তো সেলোক মরছে কোন্ চুলোয়?'

'ভাল্ কার্নিঔ-তে। এখান থেকে চার কার্টসেস্ দূরে।'

'নাম কি তোমার বাবার?'

'ভর্ট কার্তিফ।'

তিন

বড় নির্দয় মানুষ এই ডাক্তার ত্রিফাল্গাস। সমবেদনা বলতে কিছু নেই তাঁর অন্তরে। নগদ টাকা হাতে না পেলে রুগী দেখেন না। তাও অগ্রিম দেয়া চাই। ভদ্রলোকের কুকুরটারও হৃদয় আছে, কিন্তু তাঁর বোধহয় নেই।

কুকুরটার নাম হারজফ। বয়স হয়েছে। বুলডগ আর স্প্যানিয়েলের সংমিশ্রণ।

শুধু অগ্রিম নগদেই সন্তুষ্ট নন ডাক্তার। তার ফী-ও আকাশছোঁয়া। একেক রকম রোগের জন্য একেক রকম ফী। টাইফয়েড হলে যা, হৃদরোগ হলে তার চেয়ে বেশি। ডজন ডজন রোগ দরকার মত বানিয়ে নেন ডাক্তার সাহেব, ফী ধার্য করেন খেয়ালখুশি মতো। কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই, খেয়ালখুশি মতো টাকা চাইবেন; রুগী মরুক আর বাঁচুক, তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না।

ভর্ট কার্তিফ তাঁর চাহিদা মেটাতে পারার মত লোক নয়। একেবারেই ছাগোষা। ছেঁড়া কাঁথা সম্বল, এমন ধরনের মানুষ। তার ওপর বিরাট পরিবার পুষতে গিয়ে দুরবস্থার একশেষ। দূর! দূর! এরকম মক্কেলের রোগ সারাতে এই দুর্যোগের রাতে বেরোনো যায়?

ডাক্তারের কোন ঠেকা পড়েনি।

বিমুখ হতে হলো বেচারী মেয়েটিকে।

শুতে শুতে আপনমনেই ঝাল ঝাড়তে লাগলেন ডাক্তার, 'খামোকা ঘুমটা ভাঙাল। এমন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বিছানা ছেড়ে ওঠার দামই তো নিদেনপক্ষে দশ ফ্রেৎজার্স।'

বিশ মিনিট যেতে না যেতেই আবার ছয়-চার বাড়িটা মুখরিত হলো ঠকাঠক্ ঠক্ঠক্ শব্দে। আবার কে এলো এই অসময়ে?

আগন্তুকের মুণ্ডপাত করতে করতে বিছানা ছাড়লেন বিরক্ত ডাক্তার। জানালা দিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালেন।

'কে ওখানে?'

'ভর্ট কার্তিফের বউ।'

'অপদার্থ ভর্ট কার্তিফ?'

'হ্যাঁ। আপনি না এলে মরে যাবে ও।'

'বেশ, তাই হোক। তুমি তার বিধবা হও।'

'এই নিন কুড়ি ফ্রেৎজার্স।'

'চার কার্টসেস্ রাস্তা ঠেঙিয়ে অতদূরে যাব মাত্র বিশ ফ্রেৎসার্জের জন্যে?'

'ডাক্তার সহেব, প্লীজ!'

'জাহান্নামে যাও।'

আবার দড়াম করে বন্ধ হলো জানালার পাল্লা। ভেবেছে কি ভর্ট কার্তিফের ভাবী-বিধবা! মাত্র বিশ ফ্রেৎজার্স নিয়ে এসেছে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে! এই ঠাণ্ডায় হাত-পায়ের গাঁট ফুলতে পারে, তার দামই তো বিশ ফ্রেৎজার্স। রাত শেষ হলেই তো বেতো এডজিনগোভের ঘাড় মুচড়ে পঞ্চাশ ফ্রেৎজার্স আদায় হবে। প্রতি ভিজিটে কড়কড়ে পঞ্চাশটা ফ্রেৎসার্জ আদায় করে চলেছেন ডাক্তার বেতো বড়লোকটার কাছ থেকে।

ঝড় বাদলার রাতে বিশ ফ্রেৎজার্সের জন্যে এত কষ্ট করার কোন মানেই হয় না।

পঞ্চাশ ফ্রেৎজার্সের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন ডাক্তার।

চার

ফ্রিৎ! ফ্ল্যাক! ফ্রিৎ! ফ্ল্যাক!

আর তার পরপরই আবার ফ্রক! ফ্রক! ফ্রক!

দরজায় এবার আঙুলের যে তিনটে টোকা পড়ল, তা আগের শব্দগুলোর চেয়ে অনেক জোরাল। যে হাতে এ টোকা পড়ছে, সে হাত অনেক বলিষ্ঠ এবং নিষ্কম্প।

ডাক্তার তখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। ওই রকম বিকট আওয়াজে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে সপ্তমে উঠল মেজাজ। এক ঝটকায় জানালার পাল্লা খুলতেই মেশিনগানের একটানা গুলির মতো গুঞ্জন এলো কানে।

'কে ওখানে?'

'সেই অপদার্থটার মা।'

'আবার?'

'হ্যাঁ।'

'জাহান্নামে যাও! মেয়ে-বউ আর তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে মরে দোজখে যেতে পারছে না ভর্ট কার্তিফ!'

'হার্টের রোগ ভীষণ বেড়েছে আমার ছেলের। স্ট্রোক...'

'মরুক হাড় হারামিটা! রাতবিরেতে...'

টাকা এনেছি। আপনি না এলে আমার নাতনি হারাবে বাপকে, বৌ হারাবে স্বামীকে। আর...আর আমি হারব আমার ছেলেকে!'

বুড়ির গলার আওয়াজটা যেন কেমন। করুণ, কিন্তু একইসঙ্গে ভীষণ দৃঢ়। দারুণ ঠাণ্ডায় পানিতে চুপচুপে ভিজে রক্ত জমে যাওয়ায় কণ্ঠস্বর ওরকম হয়েছে বোধহয়। বরফশীতল বৃষ্টিতে ভিজে হাড় পর্যন্ত কাঁপছে নিশ্চয় ঠক্‌ঠক্ করে।

'স্ট্রোক হয়েছে তো? তাহলে তো দুশো ফ্রেৎজার্স লাগবে,' হৃদয়হীন ডাক্তার বললেন আপদ বিদেয় করার জন্যে।

'অত তো নেই, একশ কুড়ি আনতে পেরেছি।'

'তবে সরে পড়!' বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল জানালার পাল্লা।

কিন্তু পরক্ষণেই টাকার লোভ কিলবিল করে উঠল অর্থলোভী ডাক্তারের মাথার এককোটি বিশলক্ষ কোষে। একশো বিশ ফ্রেৎজার্সই কম কিসে? মাত্র দেড়ঘণ্টার পথ আর আধঘন্টার রুগী দেখা! ঘণ্টায় ষাট ফ্রেৎজার্স কম নয়। মিনিটে এক ফ্রেৎজার্স। সামান্য লাভ যদিও, কিন্তু অযাচিত সৌভাগ্য পায়ে ঠেলা কি উচিত?

কাজেই বিছানায় আর উঠলেন না অর্থপিশাচ ডাক্তার। জামাকাপড় চাপিয়ে নিলেন গায়ে। পায়ে গলালেন উরু পর্যন্ত ঢাকা বিরাট চামড়ার বুট। গ্রেটকোটে সারাশরীর আবৃত করে মাথায় পরলেন টুপি, হাতে দস্তানা। মেটিরিয়া মেডিকা নামের ডাক্তারী বইটার খোলা ১৯৭ পৃষ্ঠার পাশেই জ্বলন্ত লণ্ঠনটা রেখে বেরিয়ে এলেন সদর দরজায়। থমকে দাঁড়ালেন চৌকাঠে।

আশি বছরের দারিদ্র্যে ভারাক্রান্ত বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে।

'কোথায় তোমার একশ বিশ ফ্রেৎজার্স?'

'এই নিন। ঈশ্বর আপনাকে একশো গুণ টাকা যেন দেন!'

'ঈশ্বর! ছোহ্! ঈশ্বরের টাকার রঙ কেউ কখনও দেখেছে? টাকা এইভাবেই রোজগার করতে হয়, আমি যেভাবে করছি। ঈশ্বরের দিতে বয়ে গেছে!'

শিস্ দিয়ে হারজফকে ডেকে নিলেন ডাক্তার। একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিলেন তার মুখে। সমুদ্রের ধার বরাবর রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললেন রুগী দেখতে।

পেছন পেছন নিঃশব্দে হাঁটছে বুড়ি। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েও অদ্ভুত দৃঢ় তার প্রতিটি পদক্ষেপ।

পাঁচ

ফ্রিৎ আর ফ্ল্যাকের যুগল উন্মত্ত উন্মাদনায় ক্ষ্যাপাটে এই আবহাওয়া অকল্পনীয়।

ঢনাঢন্ ঢনাঢন্ বাজছে ঘণ্টাঘরের পাগলা ঘণ্টাগুলো। খুবই অশুভ লক্ষণ। তবে, ডাক্তার ক্রিফালগাস কুসংস্কার মানেন না। কিছুই মানেন না তিনি। এমনকি নিজের পেশা এই যে চিকিৎসা বিজ্ঞান, তার ওপরেও এক বিন্দু আস্থা নেই তাঁর। টাকার প্রয়োজনে শুধু কাজটা করে যাওয়া। জ্ঞানটুকু কাজে লাগিয়ে যতখানি চুষে নেয়া যায় আর কি।

যেমন আবহাওয়া তেমনি রাস্তা! ঢিবি ঢিবি পাথরগুলো সামুদ্রিক শ্যাওলায় পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। পদে পদে পা হড়কে যাচ্ছে, গোড়ালী মচকে যেতে পারে! সেইসঙ্গে মচাৎ মচাৎ করে আগ্নেয় ছাইয়ের গাদা ভাঙছে বুটের তলায়। আলোর কণাও নেই

কোথাও, সামনের ঐ ঝুলন্ত লণ্ঠনটি ছাড়া। লণ্ঠনটা ঝুলছে আর দুলছে হারজফের দাঁতের ফাঁকে। হাওয়ার ঝাপটায় আগুনের শিখা দপ্‌দপ্‌ করে উঠছে মাঝে মাঝে—যেকোন সময় নিভে যেতে পারে। অনেক দূরে অবশ্য ঝিলিক মেরে আগ্নেয়গিরির মাথায় জ্বলে উঠছে প্রাকৃতিক লণ্ঠন । আগুনের তীব্র শিখা ধেয়ে যাচ্ছে কালো কালো দানবের মতো মেঘগুলো লক্ষ্য করে। অস্পষ্ট ছায়া পড়ছে এখানে ওখানে...মনে হচ্ছে ধূসর ছায়ার মাঝে যেন কত অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে আজও। কি আছে ওই আগুনপাহাড়ের অন্তহীন গহ্বরে, কেউ তা জানে না। জ্বালামুখের অতল গভীরে হয়তো আস্তানা গেড়েছে মৃতদের আত্মা, মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে বাষ্পাকারে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে, কখনও কখনও হয়তো আরও ওপরে উঠে ছেয়ে ফেলছে আকাশ-বাতাস।

কিন্তু পাতাল রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই ডাক্তারের। কড়কড়ে একশো বিশ ফ্রেৎজার্স পকেটে গুঁজে হন্‌ হন্‌ করে তিনি হেঁটে চলেছেন বন্ধুর পথে। দৃঢ় পদক্ষেপে অনুসরণ করছে রুগীর বৃদ্ধা মা। বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের মাতামাতিতে সাদা হয়ে গিয়েছে সাগর। বড় বড় ঢেউ পাথুরে উপকূলে মাথা কুটে হতাশ হয়ে ফিরে যাচেছ সাগরে। ফসফরাসের দ্যুতি বিতরণ করে যাচ্ছে যাবার সময়ে।

মাঝে মাঝে ঘুরে যেতে হচ্ছে কাঁটাঝোপ ভরা বালিয়াড়ি। রাইফেলের বেয়োনেটের মত ওই ছুঁচোলো ঝোপের মধ্যে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

কুকুরটা লণ্ঠন মুখে নিয়ে এতক্ষণ দৌড়োচ্ছিল অনেক আগে আগে। এবারে তার উৎসাহেও যেন ভাটা পড়েছে। পিছিয়ে এসেছে ডাক্তারের সান্নিধ্যে। বারে বারে মুখ ফিরিয়ে চাইছে। নিরব ভাষায় অদ্ভুত চাহনির মধ্যে দিয়ে যেন বলতে চাইছে,

'খারাপ কী, ওস্তাদ! সেফ-এ তো জমা হলো একশো বিশ ফ্রেৎসার্জ! এভাবেই তো কপাল ফেরাতে হয়। বিন্দু বিন্দু জলেই তো সিন্ধু তৈরি হয়, ছোট্ট ছোট্ট পাথর নিয়ে গড়ে ওঠে হিমালয়। এ টাকায় আঙুরের বাগানটা আরও কয়েক বিঘে বাড়িয়ে নেয়া যাবে। রাতের খাবারে আরও একটা বাড়তি পদ যোগ করা যাবে! আমার কপালেও জুটবে বাড়তি কয়েকটা হাড়! বড়লোক গরীব দেখলেই শোষণ করুক।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বৃদ্ধা। আঙুল তুলে দেখাল ছায়াময়তার ভেতর একটা লালচে আলো। এসে গেছে অপদার্থ ভট কার্তিফের পর্ণ কুটির।

'ওই বাড়ি তো?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বৃদ্ধা।

অমনি গলার মধ্যে গর্‌গর্‌ আওয়াজ করে উঠল হারজফ।

আর ঠিক তখনি, আচম্বিতে বিকট গর্জনে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিল আগুনপাহাড়। যেন, পাহাড়ের মূল পর্যন্ত থরথরিয়ে কেঁপে উঠল লক্ষ বিস্ফোরণে।

পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল ভীষণ ভাবে। বিজলীর মতো একটা তির্যক অগ্নিশিখা চকিতে ধেয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে অন্ধকার আকাশে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মেঘগুলো!

ওরকম বিরাট ধাক্কায় কোনো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। আমাদের চিকিৎসকও আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন পাথুরে মাটিতে।

মুখ থুবড়ে পড়েই আগ্নেয়গিরির চোদ্দোগুষ্টি উদ্ধার করতে করতে টলতে টলতে কোন রকমে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার, বিস্ফারিত চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখে নিলেন চারদিক।

বুড়ি কোথায়?

এই তো ছিল! এখন নেই!

অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি? উড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা কুয়াশাপুঞ্জের মাঝে?

কুকুরটা অবশ্য রয়েছে। তবে আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে তার সারা দেহে। শিরদাঁড়াটা ধনুকের মত বেঁকিয়ে ভর দিয়ে রয়েছে পেছনের দু-পায়ের ওপর। ফাঁক হয়ে আছে চোয়াল। হাঁ করা মুখ থেকে ঠিকরে গিয়ে মাটিতে পড়ে নিভে গিয়েছে লণ্ঠনটা।

'যত্তো সব উদ্ভট ব্যাপার।' খেঁকিয়ে উঠে তাড়া লাগালেন ডাক্তার। 'চল্, চল্, এগিয়ে চল্।'

হাজার হোক, বেঈমানি করা মানায় না তাঁকে। যৎসামান্য সুনামটুকু আর নষ্ট করতে চান না বৃদ্ধার আকস্মিক রহস্যময় অন্তর্ধানে। ফী যখন নিয়ে ফেলেছেন, কর্তব্য তো পালন করতে হবে।

ছয়

মাত্র আধ কার্টসে দূরে টিম টিম করে জ্বলছে লাল আলোটা। সামান্য একটা আলোর কণা। মুমূর্ষুর লণ্ঠনের আলো নিশ্চয়, অথবা মরে কাঠ হয়ে যাওয়া ভর্ট কার্তিফের মড়ার পাশে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে ম্লান দীপশিখা।

বুড়ি গায়েব হয়ে যাওয়ার আগে ওই বাড়িই দেখিয়ে দিয়ে গেছে, ভুল হবার কথা নয়।

ফ্রিৎ-এর শিস আর ফ্ল্যাক-এর ঝমাঝম বর্ষাধারার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললেন ডাক্তার কর্তব্য সমাপন করতে।

দূরত্ব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটার চেহারাও ক্রমশ স্পষ্ট

হয়ে উঠছে। ন্যাড়া শহরতলিতে নিঃসঙ্গ একটা বাড়ি। তবে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে খটকা লাগল ডাক্তারের। লাক-ট্রপে তাঁর নিজের ছয়-চার বাড়িটার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে এই বাড়ির। সামনের জানালাগুলো একইরকম, ধনুকের মত খিলানওয়ালা দরজাটাও ঠিক যেন একই।

ঝড়ের দাপটে তাড়াতাড়ি যেতেও পারছেন না ডাক্তার। হাওয়া ঠেলে এগোতে গিয়ে দম বেরিয়ে গেল তাঁর। তবুও যেতে হবে, কর্তব্য বড় কঠিন।

এসে গেছে সদর দরজা। আধখোলা পাল্লাদুটো ঈষৎ ঠেলে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝড়ের ধাক্কায় দড়াম করে দুটো পাল্লাই বন্ধ হয়ে গেল পেছনে।

হারজফ রয়ে গেল বাইরে। থাকুক। তার হাঁকডাক তো শোনা যাচ্ছে ভেতর থেকেও। তবে মাঝেমাঝে গলায় ছিপি আটকে যাচ্ছে যেন। কোরাস গান গাইতে গাইতে ছেলেরা যেমন বিরতি দেয়, হারজফও তেমনি ঘেউঘেউ গরগর ডাকে বিরতি দিচ্ছে থেকে থেকে। স্বর রুদ্ধ হচ্ছে যেন।

এ কোথায় এসে পড়লেন ডাক্তার?

ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!

যে কেউ এই অবস্থায় বলে বসবে, আরে এত ডাক্তার ক্রিফালগাসেরই বাড়ি। এতটা পথ হেঁটে তিনি যেন ফিরে এসেছেন নিজেরই বাড়িতে। কিন্তু তিনি তো পথ তো হারাননি! একবারও বাঁক নেননি। কোন সন্দেহ নেই, তিনি গন্তব্যেই পৌঁছেছেন, লাক-ট্রপে ফিরে যাননি।

তাহলে এই ধনুকাকৃতি সিলিং? এই কাঠের সিঁড়ি? বহু হাতের ঘষা খেয়ে ক্ষয়ে আসা রেলিংয়ের কাঠ?

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন বিমূঢ় ডাক্তার। পৌঁছোলেন একটা

চাতালে। সামনেই এ ও। দরজা। ক্ষীণ আলো রয়েছে দরজার মাথায়। ঠিক অমনই থাকে ছয়-চার বাড়িতে।

কি হলো? মরীচিকা দেখছেন নাকি ডাক্তার? চোখের ভুল? ম্যাড়মেড়ে আলোয় ঘরের প্রতিটি সামগ্রী চিনতে পারলেন একপলকেই।

ঐ তো সেই হলুদ সোফা সেট, ডানদিকে কাঠের প্রাচীন বাক্স, বাঁ দিকে লোহা বাঁধাই সিন্দুক, যে সিন্দুকে তিনি ফিরে গিয়ে একশো বিশ ফ্রেৎজার্স সযত্নে সাজিয়ে রাখবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন। ওই তো তাঁর প্রিয় হাতলচেয়ার, চামড়ার বালিশগুলো সাজানো রয়েছে একই কায়দায়। টেবিলটাও তো তাঁর! পাশেই লণ্ঠনের গা ঘেঁষে ১৯৭ পৃষ্ঠায় খোলা রয়েছে তাঁর মেটিরিয়া মেডিকা বইটা।

'কি হলো আমার!' নিজের কানেই নিজের কথা অদ্ভুত শোনাল ডাক্তারের। এরকম হতভম্ব জীবনে তিনি হননি। ভয়ও পেয়েছেন। বিপদের ঘণ্টা বাজছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে। বিস্ফারিত দু'চোখ। সারাদেহ যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে আসতে চাইছে আগুয়ান ভয়াবহ কিছু একটার আশঙ্কায়। শীতল ঘামে ভিজে গেছে সারা গা। ঘর্মাক্ত দেহে অনুভব করছেন বিচিত্র রোমহর্ষক অনুভূতি। দাঁড়িয়ে গেছে দেহের প্রতিটি লোম।

ধ্যাত! হাতের কাজটা চটপট সেরে ফেলা যাক। লণ্ঠনের তেল নিশ্চয়ই শেষ প্রায়। শিখা নিভুনিভু। নিভু-নিভু মুমূর্ষুর জীবন প্রদীপও!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওই খাট তো তাঁরই। হ্যাঁ, তাঁরই। ওই কারুকাজ করা পায়া, বাহারি চন্দ্রাতপ, চারপাশে ঝুলন্ত ফুলের এমব্রয়ডারী করা পর্দা—এযে তাঁরই প্রিয় খাট। ভারি আশ্চর্য তো! অপদার্থ ভর্ট কার্তিফ এমন বিছানার মালিক, এতো ভাবাও যায়

না। সত্যিই কি তাই?

হাত কাঁপছে ডাক্তারের। কাঁপা হাতে পর্দা খামচে ধরে সরিয়ে দিলেন আস্তে আস্তে, ভেতরে তাকালেন সাবধানে।

সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুধু মাথা বের করে রেখেছে রুগী। নিস্পন্দ দেহ। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দেরি নেই।

ঝুঁকে পড়লেন ডাক্তার।

পরমুহূর্তেই বিকট বিকৃত আর্তনাদ বেরিয়ে এল তাঁর গলা চিরে। তাঁর আর্তনাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাইরে থেকে অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠল কুকুরটা। অমঙ্গলের সূচনা ঘটল যেন সেই অস্বাভাবিক ঘেউঘেউ ডাকের মধ্যে।

মুমূর্ষু ব্যক্তি ডাক্তার ক্রিফালগাস্ স্বয়ং, অপদার্থ ভর্ট কার্তিফ নয়! স্ট্রোক হয়েছে! হয়েছে তাঁর নিজের! হায়হায়, সেরিব্র্যাল অ্যাপোপ্লেক্সি, করোটি-রন্ধ্রে হঠাৎ জমে গেছে রক্ত! পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে তাঁরই দেহের একদিক।

না, আর কোন ভুল নয়। তাঁর নিজের মুমূর্ষু অবস্থাতেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে রোগ নিরাময়ের জন্যে। তাঁর নিজের চিকিৎসার জন্যেই তাঁর পকেটে দেয়া হয়েছে একশো বিশ ফ্রেৎজার্স। অথচ হৃদয়হীন ডাক্তার আসতে চাননি, রুগীকে শেষ চিকিৎসা দিতে চাননি। এখন দেখছেন মৃত্যুর সামনে নিজেকেই।

উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন বোধহয় ডাক্তার ক্রিফালগাস্। চিন্তা বুদ্ধি যেন লোপ পেল, অসাড় হয়ে এল শিরা উপশিরা কোষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন মিনিটে মিনিটে বাড়ছে তাঁর মৃত্যুর লক্ষণ। নিজের শক্তিই যে শুধু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তা নয়; হৃৎস্পন্দন আর শ্বাস প্রশ্বাসও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে, জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলছে। অথচ...অথচ...তিনি জানেন তিনি আসলে কে, বিস্মৃতি এখনও আচ্ছন্ন করেনি তাঁর চেতনা। সজ্ঞানে অসহায়

অবস্থায় উপলব্ধি করছেন তিনি, প্রত্যক্ষ করছেন নিজেরই মৃত্যু!

কি করবেন এখন? হিসেবী হাতে চিকিৎসা করে রক্তের চাপ কমিয়ে দেবেন? বিন্দুমাত্র দ্বিধা মানেই সর্বনাশ এখন! জীবনপ্রদীপ নিভে যাবে ডাক্তার ক্রিফালগাসের।

ক্ষিপ্র হাতে যন্ত্রের বাক্স খামচে ধরলেন ডাক্তার। এক ঝটকায় একটা ল্যানসেট টেনে নিয়ে তাঁরই দ্বিতীয় সংস্করণের বাহুতে চিরে দিলেন একটা শিরা। কিন্তু রক্ত আর প্রবাহিত হচ্ছে না তাঁর নিজের বাহুতে!

উন্মাদের মত হাত ঘষতে লাগলেন দ্বিতীয় সংস্করণের বুকে। উপলব্ধি করলেন তাঁর নিজের বুকের উত্থান-পতন থেমে আসছে একটু একটু করে। উত্তাপ সঞ্চারণ করলেন দ্বিতীয় সংস্করণের পায়ের চেটোয়। অনুভব করলেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তাঁর নিজেরই পায়ের তলা।

হঠাৎ প্রাণপণ চেষ্টায় শরীরটাকে শয্যা থেকে তুলে ধরল তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণ, ছটফট করতে করতে সারা দেহটাকে দুমড়ে মুচড়ে তেড়াবেঁকা করে শুরু হয়ে গেল হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি, দাঁতে দাঁতে ঘষাঘষি। খটাখট আওয়াজ উঠল। মৃত্যুর আওয়াজ!

চিকিৎসাশাস্ত্রে এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও একপলকে মারা যেতে হলো ডাক্তার ক্রিফালগাসকে, তাঁর নিজেরই হাতের ওপরে।

ফ্রিৎ! ফ্ল্যাক! ফ্রিৎ! ফ্ল্যাক! ফ্রিৎ! ফ্ল্যাক! ঝড় আর বৃষ্টি। ঝড় আর বৃষ্টি! হাহাকার আর আর্তনাদ, উল্লাস আর আস্ফালনে মেতেছে যেন বিশ্বচরাচর, ভূপ্রকৃতি! আগ্নেয়গিরির অগ্নিশিখার আলোয় আকাশে উৎসবের আসর সাজিয়ে ফেলল আগুন-পাহাড়!

সাত

পরদিন সকালে ছয়-চার বাড়িতে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেল। সেটা ডাক্তার ক্রিফালগাসের। শবযানে লাশ চাপিয়ে মহা আড়ম্বরে নিয়ে যাওয়া হলো লাক-ট্রপ সমাধি ক্ষেত্রে। ওই সমাধিক্ষেত্রে তিনি নিজেই পাঠিয়েছেন অসংখ্য রুগীকে। দুনিয়ার নিয়ম তাই। মৃত্যুর সামনে সবাই সমান, কেউ কারও চেয়ে বড় নয়।

হারজফ সম্পর্কে লোকের বিশ্বাস, আবার নাকি তাকে দেখা গেছে শহরতলিতে। দাঁতে কামড়ে জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে টহল দেয় সে মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে। পতিত আত্মার মতই ঘেউঘেউ ডাকে খান্ খান্ করে হারজফ নিশীরাতের থমথমে নিরবতা।

ঘটনাটা কতখানি সত্যি আমার তা জানা নেই। তবে ভল্সিন দেশে এরকম অনেক অদ্ভুত ঘটনাই তো ঘটে, বিশেষ করে লাক-ট্রপের আশে পাশে।

তবে হ্যাঁ, আবার বলছি, ম্যাপে খুঁজতে যাবেন না এ শহরকে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ভূগোল বিশেষজ্ঞরাও আজ পর্যন্ত শহরটার অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা সম্বন্ধে একমত হতে পারেননি।

মিস্টার রে শার্প অ্যান্ড মিস্ মী ফ্ল্যাট

কালফারমাট স্কুলে তিরিশ জন ছেলেমেয়ে ছিলাম আমরা। বিশজন ছেলের বয়স ছয় থেকে বারো। দশটি মেয়ের বয়স চার থেকে নয়। গ্রামটা ঠিক কোথায় তা যদি জানতে চান তো আমার লেখা ভূগোল বইটার সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন. জায়গাটা অ্যাপ্পেনজেল পর্বতমালার কোলে, সুইজারল্যান্ডে।

সেদিন উইলিয়াম টেল-এর গল্পটা হাজারবারের মতো শোনানোর পর মাস্টার সাহেব ধমকে উঠলেন আমাকে। আসলে আমি তখন খাতার পাতায় নানারকম মুখ আঁকছিলাম। ধমক খেয়ে বেমালুম মিথ্যে বলে দিলাম, স্যার যা বলছেন, তা লিখে যাচ্ছি। খুশি হলেন স্যার। উইলিয়াম টেল তার ছেলের মাথায় আপেল রেখেছিল কিনা, জানতে আমার বয়ে গেছে।

গাছপালা ঘেরা নিচু জায়গায় গ্রামটা, রোদ কখনও ঢোকে না। গ্রামের একদম শেষে স্কুলটা। স্কুলের মত নিরস চেহারা নয় মোটেই, খোলা বাতাসে চমৎকার বাড়িটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। খেলার মাঠ আছে। স্কুলের ঘণ্টির ঝঙ্কার শুনলে মনে হয় যেন গাছের ডালে বসে পাখি ডাকছে।

মিস্টার ভালরুগিস আর তাঁর অবিবাহিতা বোন লিসবেথ,

দু'জন মিলে চালান এই স্কুলটা। বৃহস্পতি আর রোববার ছাড়া রোজ আসি সকাল আটটায়, পিঠে খাবারের ঝুড়ির ওপর স্কুলের ব্যাগ চাপিয়ে। টিফিনের সময় সমস্ত খাবার চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে বাড়ি যাই বিকেল চারটেয়। দুপুরে ঠাণ্ডা রুটি, মাংস, পনির, ফল আর এক গ্লাস ছোটদের ওয়াইন পাওয়া যায় স্কুলেই।

আমাকে ধমকেই মাস্টার সাহেব পাকড়াও করলেন বেটিকে। ওর পুরো নাম বেটি ক্লেরে। ফুটফুটে মেয়েটাও নাকি কান দিচ্ছে না উইলিয়াম টেলের কাহিনীতে। ছেলের মাথায় আপেল রেখে বাবা তীর ছুঁড়ে মারছে আপেলে, এমন কাহিনীও যদি ভাল না লাগে তাহলে গল্পটা গান গেয়ে শোনালে নিশ্চয় ভাল লাগত, বললেন মাস্টার। গানে গানে জমে উঠত উইলিয়াম টেল-এর গল্প। কিন্তু সে রকম সুরকার তো নেই! আক্ষেপ করলেন মাস্টার। বললেন, 'ভবিষ্যতে অমন সুরকার আসবে কিনা ঈশ্বর জানেন।'

বেটি বেচারি করুণ চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। আবার শুরু হলো উইলিয়াম টেল-এর গল্প। শুনছি আমরা, মনে হচ্ছে শন্ শন্ করে তীর উড়ে যাচ্ছে ক্লাস ঘরের ভেতর দিয়ে। গত ছুটির পর থেকে এই নিয়ে অন্তত একশো বার শুনতে হলো গল্পটা।

*

আমার তখন বয়স দশ। কালফারমাট কয়্যারে গান গাইতাম অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে। গির্জার ঘর গমগম করত আমাদের আধো আধো উচ্চারণে। আমার নাম জোসেফ। বেটির নাম তো আগেই বললাম। তা সত্ত্বেও আমাদের দু'জনের নাম হয়ে গিয়েছিল মিস্টার অতি-কোমল গান্ধার আর মিস অনু-কোমল গান্ধার। কেন হয়েছিল সে কাহিনী লিখতেই বসেছি এই বুড়ো বয়েসে।

চল্লিশ বছর ধরে এই নামেই পরিচিত আমরা। আমাদের দু'জনের গানের গলা ছিল একই রকম। গান্ধার গলা। তা সত্ত্বেও বেটি কেন হলো অনু-কোমল, আর আমি কেন হলাম অতি-কোমল, এবার আসা যাক সেকথায়। তার আগে একটা কথা বলে নিই।

অনেকদিন পর শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছিল মিস্টার অতি-কোমল গান্ধারের সঙ্গে মিস অনু-কোমল গান্ধারের।

অরগ্যানবাদক এগলিস্যাক ছিলেন কয়্যার স্কুলের ডিরেক্টর। তাঁর নিষ্ঠার ফলেই আমাদের দক্ষতা জন্মেছিল ষড়জ, পঞ্চম আর মধ্যমে। গলা মিলিয়ে গাইতে পারতাম তাঁর অর্গ্যানের সঙ্গে। গানের বিভিন্ন সুর, স্বরগ্রাম, স্বরলিপি, সুরের বিস্তার নিয়ে প্রচুর সময় তিনি ব্যয় করতেন আমাদের পেছনে। বড় ভাল মানুষ ছিলেন। ছিলেন প্রতিভাধর সঙ্গীতবিদ। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গানের জগতে। চারখণ্ডে ভাগ করা অসাধারণ একটা 'ফুগ' স্বরলিপিও রচনা করেছিলেন। তাই আজ মনে হয় গানের মাস্টারের গান সম্বন্ধে স্কুল মাস্টারের অবহেলা মেশানো মন্তব্য মোটেই ঠিক ছিল না।

আমাদের জানা ছিল না 'ফুগ' স্বরলিপিটা কি। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম গানের মাস্টারকে। উনি বলেছিলেন, 'ফুগ হচ্ছে অতীন্দ্রিয় সঙ্গীত।'

ইটালিয়ান ফ্যারিনা বলে উঠেছিল ওর সবচেয়ে চড়া স্বরে, 'আমরা যদি ফুগ গাইতে পারতাম!'

জার্মান অ্যালবার্ট হস্ট খাদে গলা নামিয়ে এনে সায় দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, যদি গাইতে পারতাম!'

সবাই মিলে তখন জেদ ধরেছিলাম 'ফুগ' শেখাতেই হবে।

উনি বলেছিলেন, 'ফুগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শেখানো যাবে

না।'

আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কবে শেষ হবে?'

উনি বলেছিলেন, 'কোন কালেই হবে না।' আমরা হতবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে উনি মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন, 'ফুগ কখনও শেষ হয় না। সব সময়ই নতুন নতুন অংশ জুড়ে দেয়া হয় শেষের অংশে।'

তাই সুবিখ্যাত 'ফুগ' শেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। এই সংগীতেরই সুরের ভিত্তিতে অপূর্ব একটা ধর্মসংগীত অবশ্য আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

স্তোত্র সংগীত যখনি গাইতাম আমরা, দূর দূরান্ত থেকে সবাই ছুটে এসে শুনত মন্ত্রমুগ্ধের মত। কি যে তার ভাষা, কেউ তা বুঝত না। মনে হত ল্যাটিন, কিন্তু ঠিক নিশ্চিত করে জানা ছিল না। অদ্ভুত শব্দগুলো উচ্চারণ করে যেতাম পরম নিষ্ঠায়।

সুরকার হিসাবে অতুলনীয় ছিলেন মিস্টার এগলিস্যাক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বধির হয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও তা মানতে চাইতেন না। আমরা সরু তীক্ষ্ণ গলায় গলা ফাটিয়ে কথা বলতাম। কানের পর্দা রীতিমতো ফেটে যাওয়ার কথা সেই চিৎকারে। কিন্তু বেশ বুঝতাম, অমন চিৎকারও দু'দিন পর আর তাঁর কানে পৌঁছোবে না; বদ্ধ কালা হতে আর বেশি দেরি নেই তাঁর।

তা-ই হলো এক রোববারে। অর্গ্যান বাজিয়ে চলেছিলেন গানের মাস্টার গির্জার প্রার্থনা ঘরে। কল্পলোকের সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করছিলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। তন্ময় হয়ে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছেন ঝড়ের মত। একবারও থামছেন না। বাধা দিতে পারছি না পাছে বিরক্ত হন। কিন্তু অর্গ্যান আর সইতে পারল না। হাপরের দম ফুরিয়ে গেল। বাতাস ফুরিয়ে গেল অরগ্যানে। কিন্তু

খেয়াল নেই গানের মাস্টারের। উনি আঙুল চালিয়ে সুরের পর সুর সৃষ্টি করে চলেছেন তন্ময় হয়ে। শব্দ বেরোচ্ছে না, তবুও বাজিয়ে যাচ্ছেন।

আসলে বাজনা উনি ঠিকই শুনতে পাচ্ছেন মনের মধ্যে। শিল্পীর অন্তরাত্মা তন্ময় হয়ে যে সুর সৃষ্টি করে চলেছে, তা শিল্পীর হৃদয়েই সুরের মায়াজাল বিস্তার করছে। উনি বুঁদ হয়ে রয়েছেন সেই সুরের মাঝে। শেষকালে আমরাও বুঝলাম, যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। উনি আর কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছেন না। কারও কিন্তু সাহস হলো না কথাটা তাঁকে বলার। হাপর ছিটকে বেরিয়ে এল অর্গ্যানের ভেতর থেকে, ঠিকরে পড়ল সরু সিঁড়িতে। উনি তখনো বাজিয়ে যাচ্ছেন। সারা রাত গেল। পরের রাতও গেল। পরের দিনও আঙুল চালিয়ে গেলেন একইভাবে। শেষকালে তাঁকেও স্বীকার করতে হলো নিষ্ঠুর সত্যটা। ধরাধরি করে সবাই তাঁকে নিয়ে গেল নিস্তব্ধ কীবোর্ডের সামনে থেকে। কালা হয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু ফুগ রচনায় ক্ষান্ত হলেন না। অনন্ত এ-গান যে তাঁকে শেষ করতেই হবে। আত্মস্থ হয়ে রইলেন অসীম সংগীতের মধ্যে।

সেইদিন থেকে নিরব হয়ে রইল কালফারমাট গির্জার বিশাল অরগ্যানটা।

*

দেখতে দেখতে ছ'মাস গেল, এল নভেম্বর। সাদা বরফের চাদরে ছেয়ে গেল পাহাড়, নেমে এল রাস্তা পর্যন্ত। লাল নাক আর নীল গাল নিয়ে এলাম স্কুলে। চত্বরের কোণে দেখা হয়ে গেল বেটির সঙ্গে। হুড দিয়ে সুন্দরভাবে মাথা ঢেকে চলেছে স্কুলে। কি মিষ্টি মুখখানা! চোখের সামনে ভাসছে এখনও!

গা গরম করার জন্যে দু'জনে একসঙ্গে দৌড়ে পৌঁছোলাম

স্কুলে।

গনগনে চুল্লির কারণে ক্লাসঘর কিন্তু বেশ উষ্ণ। পিঠ সিধে করে চেয়ারে বসে আবার উইলিয়াম টেল-এর একঘেয়ে গল্প শুরু করেছিলেন মাস্টার। গল্পের অঙ্ক, আবৃত্তি, শ্রুতিলিখন, হাতের লেখা, রীডিং পরপর করে গেলাম। খুশি হলেন স্যার।

গান যা শিখেছিলাম, তা কিন্তু ভুলতে বসেছিলাম। গানের মাস্টারের জায়গায় আর কেউ তো আসেননি। অরগ্যানে মরচে পড়ছে, সেই সঙ্গে মরচে পড়ছে আমাদের গলাতেও।

গির্জার যাজক আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারছিলেন না। হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছিলেন, অরগ্যান মেরামত করা দরকার, গির্জাতে আবার গানের আসর বসা দরকার। গান ছাড়া তাঁর স্তোত্রপাঠ বেখাপ্পা লাগত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাঁর গলা ভেঙে যেত। বয়স তো হয়েছে। লোকে আড়ালে হাসাহাসি করত। এদিকে বড়দিন এগিয়ে আসছে। অরগ্যান তখনও নিরব।

অরগ্যানের বদলে অন্য বাদ্যযন্ত্র চালু করার চেষ্টাও করেছিলেন ভদ্রলোক। প্রাচীন কাঠের একটা কি যেন যন্ত্র গির্জার দেয়াল থেকে নামিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু বাজানোর লোক কোথায়? শেষকালে অরগ্যানের হাপর দিয়ে সে যন্ত্রে ফুঁ দিয়ে বাজানোর চেষ্টা করতে গিয়ে এমন বিকট বেসুরো আওয়াজ বেরোল যে মনের দুঃখে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। বেশ বুঝলাম, এবারের বড়দিন মাঠে মারা গেল। অরগ্যানের বিকল্প অথবা এগলিস্যাকের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। মুষড়ে পড়ল গোটা গ্রাম। তবে কি গির্জায় বাজনা বাজবে না বড়দিনে? তারপরে এক সন্ধ্যায় হৈ-চৈ শুরু হলো গ্রামবাসীদের মধ্যে।

সেদিন ছিল পনেরোই ডিসেম্বর। শীতের শুকনো দিন। সামান্য আওয়াজও শোনা যায় অনেক দূর থেকে। পাহাড়ের

মাথায় কথা বললে শোনা যায় গ্রাম থেকে। পিস্তল ছুঁড়লে আওয়াজ গিয়ে পৌঁছোয় কয়েক মাইল দূরের গ্রামে।

সেদিন শনিবার। রোববার স্কুল ছুটি। তাই শনিবারের সন্ধেয় গ্রামের সরাইখানায় ভোজ খেতে গিয়েছিলাম। বেটিও ছিল। ছিল আরও জনা বারো গাঁয়ের মানুষ। ঠিক হয়েছিল, খাওয়া দাওয়ার পর আমি আর বেটি গান গাইব।

খাওয়া শেষ হলো। দু'জনে গান ধরতে যাচ্ছি, এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল সুস্পষ্ট একটা শব্দ। অর্গ্যানের বাজনা!

কিন্তু অর্গ্যান বাজবে কি করে? গ্রামে অর্গ্যান আছে একটাই, সেটা গির্জায়। সেটা তো খারাপ হয়ে পড়ে আছে, মেরামতি দরকার।

কিন্তু অর্গ্যানই তো! আকাশ বাতাস গমগম করছে সুরেলা আওয়াজে!

তাহলে কি শয়তান বাজাচ্ছে? কিন্তু শয়তান কি অর্গ্যান বাজাতে জানে?

আমার মন বলল, না জানার কি আছে? বেটি আমার হাত আঁকড়ে ধরে ফিস ফিস করল, 'শয়তান! শয়তান?'

দুমদাম করে খুলে গেল চত্বরের চারধারের দরজা। জানালায় আবির্ভূত হলো কৌতূহলী মুখগুলো।

কেউ কেউ বলল, 'যাজক বোধহয় অর্গ্যান বাদক খুঁজে পেয়েছেন শেষ পর্যন্ত!'

তাই তো! সহজ এই ব্যাখ্যাটা এতক্ষণ মাথায় আসেনি কেন?

ঠিক সেই মুহূর্তে চৌকাঠে হাজির হলেন যাজক স্বয়ং। জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী?'

সরাইখানার মালিক বলল, 'কে যেন অর্গ্যান বাজাচ্ছে।'

'ভালই তো! এগলিস্যাক ফিরে এলো তাহলে।'

তাও তো হতে পারে! কালা হতে পারেন, কিন্তু অর্গ্যানে অঙ্গুলি সঞ্চালনে বাধা কোথায়? হয়তো হাপর লাগিয়ে নিজেই মেরামত করে নিয়েছেন সাধের বাজনযন্ত্র। কিন্তু এদৃশ্য না দেখলেই নয়!

দৌড় দিলাম গির্জার দিকে। কিন্তু একী! দরজা তো বন্ধ!

আমার ওপরেই হুকুম ঝাড়লেন যাজক, 'জোসেফ, তুই দৌড়ে যা তো তোর গানের মাস্টারের কাছে।'

বেটি কিন্তু আমার হাত ছাড়তে রাজি নয়। দু'জনই ছুটলাম। ফিরে এলাম পাঁচ মিনিটেই। রুদ্ধশ্বাসে জানালাম, গানের মাস্টার তো বাড়িতেই রয়েছেন। চাকরের মুখে এই মাত্র শুনে এলাম। ঘুমাচ্ছেন তিনি। কালা মানুষ বলেই অর্গ্যানের গুরুগম্ভীর নিনাদেও নিদ্রাভঙ্গ হয়নি তাঁর।

তাহলে বাজনদারটি কে?

হাতের আস্তিন গুটিয়ে যাজক বললেন, 'আমি দেখছি।'

অর্গ্যান কিন্তু সমানে বেজে চলেছে। সুরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে গির্জার চার দেয়ালের বাইরে। ষোল ফুট লম্বা নলগুলো থেকে হুঙ্কারের পর হুঙ্কার বেরিয়ে আসছে। বিশাল ন্যাসার্ড থেকে ঠিকরে আসছে সুর লহরী। এমন কি সবচেয়ে গম্ভীর নাদ ছাড়ে যে বত্রিশ ফুট লম্বা নলগুলো, সেগুলোও কানে তালা লাগানো ঐকতানে মিশে গেছে। সংগীতের তুষার ঝড়ে যেন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চলছে চত্বর জুড়ে। সংগীতের এই সাগরের ঢেউ শুনলে যে কেউ বলে বসত, গোটা গির্জাই যেন একটা অর্গ্যানকেস হয়ে গেছে। ঘণ্টা ঘরটা বুঝি অর্গ্যানের মোটা সুরের বাজনা, প্রকম্পিত করে তুলছে চারদিক।

দরজা বন্ধ ছিল আগেই বলেছি। কিন্তু দেখা গেল, সরাইখানার উল্টো দিকে ছোট দরজাটা আধখোলা। যাজকের

পেছন পেছন গ্রামের চৌকিদার ভেতরে ঢুকল ওই পথে। প্রথমেই তারা ক্রুশচিহ্ন এঁকে নিল বুকে। সাবধানের মার নেই!

আমরা ক'জন গেলাম পেছন পেছন।

অর্গ্যান স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। শেষ সুরটা কাঁপতে কাঁপতে হারিয়ে গেল খিলানের অন্ধকারে।

তবে কি আমরা ঢুকেছি বলেই সুর কেটে গেল রহস্যময় বাদকের? অন্ধকারে বিরাট বিরাট থামের পাশে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করলাম। না তো, আর কোন শব্দ তো শোনা যাচ্ছে না! অকস্মাৎ যেমন শুরু হয়েছিল, আচমকা তেমনি থেমে গিয়েছে গানের গমক। গির্জা-ঘর এখন নিস্তব্ধ, নিথর! হঠাৎ বজ্র বিদ্যুতের পর চোখ ধাঁধিয়ে গেলে যে অবস্থা হয়, আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা তখন ঠিক সেরকম।

থমথমে নৈঃশব্দ্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেল পরক্ষণে। স্থানুর মতো তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। অসমসাহসী আমাদের ক'জনকে নিয়ে পাহারাদার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে গির্জার ভেতরে অর্গ্যান-মঞ্চের দিকে চলল। টপাটপ লাফ মেরে সিঁড়ি টপকে পৌঁছোলাম গ্যালারিতে। কাউকে দেখতে পেলাম না ওখানে। অর্গ্যানের কীবোর্ডের ওপর ঢাকনা চাপা দেয়া। কিন্তু হাপরের মধ্যে তখনও কিছু বাতাস রয়ে গেছে। বেরোবার পথ না পেয়ে ফুলে রয়েছে ওটা। ওঠানো রয়েছে লিভারটা।

হট্টগোল শুনে বোধহয় আগন্তুক বাদক ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে নিচে, ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে গ্রামে।

পাহারাদার ঘ্যান ঘ্যান করছিল, ওঝা ডেকে ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা যাতে করা হয় গির্জাতে। রাজি হলেন না যাজক।

*

পরদিন একজন লোকসংখ্যা বাড়ল গ্রামের। একজন না বলে

দু'জন বলাই উচিত। চত্বরে ঘুরঘুর করতে দেখা গেল দু'জনকে, রাস্তা বরাবর হেঁটে পৌঁছোল তারা স্কুল পর্যন্ত, তারপর ফিরে গেল সরাইখানায়। দু'বিছানাওয়ালা একটা ঘর ভাড়া নেয়া হয়েছে সেখানে। কিন্তু কদিনের জন্যে, তা জানে না কেউ।

বেটির মুখে শুনলাম, দু'জনের একজন নাকি বলেছে, 'একদিনের জন্যে হতে পারে, এক হপ্তা, একমাস, অথবা এক বছরের জন্যেও হতে পারে।'

জিজ্ঞেস করতে বেটি আরও বলল, 'এরাই হয়তো কাল রাতে অর্গ্যান বাজিয়ে চমকে দিয়েছিল গ্রামের সবাইকে। মোটা লোকটা হয়তো নিজেই একটা হাপর।'

কিন্তু তারা যে লোক কি রকম, তা বেটি বলতে পারল না। গ্রামের কেউই কিছু বলতে পারল না।

ওদের মাথা প্রত্যেকের একটাই। দুটো করে হাত। পায়ের সংখ্যাও দুটো। বেলা এগারোটা নাগাদ অদ্ভুত এই মূর্তি দুটোকে দেখেই কিন্তু খটকা লাগল আমার।

দু'জনে হাঁটছে, কিন্তু একজন আরেকজনের পেছনে। পাশাপাশি নয়।

যার বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, মাথায় সে বেশ দীর্ঘ। রোগা লিকলিকে শরীর, ঠিক যেন একটা বড় আকারের সারস পাখি। গায়ে হলদেটে ফ্রককোট, পা দুটো টাইট প্যান্টে ঢাকা। একদম তলায় ছুঁচোলো মাথাওয়ালা জুতো। মাথায় পালকের বনেট টুপি। মুখের কি ছিরি! দাড়ি গোঁফের চিহ্ন মাত্র নেই। গর্তে বসানো চোখ দুটোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যেন আগুন জ্বলছে ভেতরে। চোখ ঘিরে গোল বলিরেখা। ঝকঝকে ধারাল দাঁত। নাকটা ছুঁচোল। ঠোঁটে চেপে বসা ঠোঁট। চিবুক যেন বাদাম ভাঙার হাতুড়ি। আর আঙুলগুলো এমন বিদঘুটে লম্বা যে কীবোর্ডের

অর্ধেকটা একবারে নাগালের মধ্যে পাবে।

অন্য লোকটা মোটা। বিরাট মাথায় উস্কখুস্ক চুল। মাথায় একটা ধূসর রঙের ফেল্ট হ্যাট। মুখ যেন অবিকল একটা গোঁয়াড় ষাঁড়ের মতো। আর পেট যেন আস্ত একটা পিপে; মনে হলো কীবোর্ডের সব চেয়ে মোটা সুর বেরোবে ওটার ভেতর থেকে। লোকটার বয়স তিরিশ হবে। দেখতে সে সবমিলিয়ে এমনই যে গ্রামের সবচেয়ে পালোয়ান লোকটাও কুঁকড়ে যাবে তার সামনে।

কেউ এদের দেখেনি আগে। এ তল্লাটে এই তাদের প্রথম আগমন। কিন্তু কোত্থেকে? সুইস নিশ্চয় নয়। পর্বতমালার ওপারের পুব দেশ থেকে নিশ্চয়। হাঙ্গেরি ওদিকে।

পরে জেনেছিলাম অনুমানটা মিথ্যে নয়।

সরাইখানায় আগাম এক সপ্তাহের টাকা দিয়ে দু'জন মিলে গোগ্রাসে গিলেছে সকালের নাস্তা। চাটনি পর্যন্ত বাদ দেয়নি, চেটেপুটে খেয়েছে। তারপর বেরিয়েছে গ্রামের রাস্তায় টহল দিতে। ঢ্যাঙা লোকটা তো কোন জায়গাতেই উঁকি মারতে ছাড়েনি। গান গেয়ে গেছে বিরামবিহীন ভাবে। হাত নাড়িয়ে গেছে সমানে। লোকটার একটা অদ্ভুত মুদ্রাদোষ আছে। যখন তখন নিজের কাঁধ চাপড়ে বলত, 'শুদ্ধ ধৈবত...শুদ্ধ ধৈবত! ঠিক আছে!'

তার সঙ্গী মোটা মানুষটা গোদা পিঠ নিয়ে যেন গড়িয়ে যেত বলের মত। সর্বক্ষণ পাইপ টেনে চলেছে। সেই পাইপ এতোই বড় যে-দেখলে মনে হয় আস্ত একটা স্যাক্সোফোন। জাহাজের চিমনি দিয়ে যেন গল্‌গল্‌ করে সাদাটে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে অনর্গল।

দেখছি দু'জনকে চোখ বড় বড় করে, এমন সময়ে লম্বা লোকটার নজর পড়ল আমার ওপর। আঙুলের ইশারায় ডাকল কাছে। কি বলব, এমন ভয় আমি জীবনে পাইনি। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করলাম না। কয়্যারে বাচ্চারা যে রকম আধো আধো গলায়

কথা বলে, সেভাবে জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'বাছা, যাজকের বাড়িটা কোনটা?'

'যাজকের বাড়ি?'

'হ্যাঁ। ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাবে আমাকে?'

নিয়ে গিয়ে ধমক খেয়ে মরব নাকি? কিন্তু না করতেও সাহস পেলাম না। বিশেষ করে লম্বুর চাহনিটা আমার রক্ত হিম করে দিল। নিরুপায় হয়ে দু'জনকে নিয়ে চললাম যাজকের বাড়িতে।

একটু দূরেই ওঁর বাড়ি। দূর থেকে দরজাটা দেখিয়ে দিয়েই এক দৌড়ে লোকগুলোর হাতের নাগালের বাইরে চলে এলাম। পেছন থেকে শুনলাম বাজনার সুরে চারবার কড়া নড়ল সদর দরজায়। প্রথম তিনটে খট খট খট শব্দ একই ছন্দে। চতুর্থ খটাৎ শব্দটায় গা কেমন শিরশির করে উঠল। যাজকের কাছে কি দরকার অদ্ভুত ওই আগন্তুকদের?

চত্বরে ফিরে গিয়ে দেখি মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে আমার অপেক্ষায়। লম্বা লোকটা আমার সঙ্গে কথা বলেছে শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল প্রত্যেকেরই।

কিন্তু আর কোন খবর আমি দিতে পারলাম না। এ গ্রামে ওরা এসেছে কেন তা বলতে পারলাম না। কেনই বা যাজকের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে তাও অস্পষ্টই রইল কৌতূহলী গ্রামবাসীদের কাছে। যাজক কিভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন রহস্যময় দুই আগন্তুককে, তা-ও পরিষ্কার হলো না।

একটু অপেক্ষা করতে হলো, কিন্তু সব ব্যাখ্যাই পাওয়া গেল সন্ধে নাগাদ।

লম্বা লোকটার নাম এফারেন। জাতে হাঙ্গেরিয়। পেশায় একাধারে শিল্পী, সুরকার, অর্গ্যান বিক্রেতা, অর্গ্যান-নির্মাতা এবং অর্গ্যান মিস্ত্রি। জীবিকার তাড়নায় সে শহরে শহরে ঘুরে বেড়ায়

এই সব গুণ নিয়ে।

মনে হলো এই লম্বা লোকটাই সেরাতে গির্জার ছোট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে অর্গ্যান বাজিয়ে গ্রামের সবার মাথা গরম করে ছেড়েছিল। আসলেই সে অর্গ্যান বাজিয়েছে। বুঝলাম কারণ সে নাকি বলেছে গির্জার অর্গ্যানের কয়েকটা অংশ মেরামত করা দরকার। খুব সস্তায় কাজটা সেরে দিতে পারে সে। এ ধরনের কাজে তার প্রশংসাপত্র আছে। সেটাও সে দাখিল করেছে যাজকের সামনে।

যাজক মহাখুশি হয়েছেন, দেরি না করে বলেছেন, 'মেরামত করে ফেলুন! কপাল ভাল তাই একজন অর্গ্যান মিস্ত্রি পেয়ে গেলাম। অর্গ্যান বাদকের কপালটা ভাল হলেই এখন বাঁচি।'

এফারেন তখন জিজ্ঞেস করল, 'এগলিস্যাক বেচারার কথা বলছেন নাকি?'

'এক্কেবারে বদ্ধ কালা হয়ে গেছেন তিনি! চেনেন নাকি তাঁকে?'

'ফুগ যে জানে, তাকে কে না চেনে বলতে পারেন?'

'ছ'মাস হলো গির্জায় গান হচ্ছে না, গানের স্কুলও বন্ধ রয়েছে। এমনকি বড়দিনটাও কাটবে গান ছাড়াই। সব ওই বেচারার জন্যে। তাঁর কান দুটো একেবারেই গেছে।'

'কোন চিন্তা করবেন না। পনেরো দিনেই ঠিক করে দেব অর্গ্যান। তারপর যদি চান তো বড়দিনের বাজনাটা আমিই বাজিয়ে দেব।' কথাটা বলেই এফারেন মটাশ্ করে এমনভাবে লম্বা আঙুলগুলো টেনে টেনে বড় করতে লাগল যেন ওগুলো রবার দিয়ে তৈরি।

দারুণ খুশি হলেন যাজক, বারবার ধন্যবাদ দিয়ে জানতে চাইলেন গির্জার অর্গ্যান সম্বন্ধে এফারেনের ধারণাটা কি।

'ভালই। তবে পুরো ভাল নয়।

'তাহলে বলুন কোন্ পার্ট্‌স্‌টা হারিয়েছে।'

'আছে সবই, কিন্তু যা নেই তা আমারই আবিষ্কার। একটা রেজিস্টার। অর্গ্যানে লাগিয়ে দিতে চাই, যদি বলেন।'

'রেজিস্টার? সেটা আবার কি?'

'বাচ্চাদের গলার রেজিস্টার। এ জিনিস অর্গ্যানে লাগালে হৈ-হৈ পড়ে যাবে। লোকে আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাবে।' বুক চিতিয়ে গড়গড় করে কয়েকজন ভদ্রলোকের নাম বলে গেল লম্বা আগন্তুক। এঁদের সুনামও নাকি ম্লান হয়ে যাবে তার আবিষ্কার কাজে লাগালে। সবাই শুধু তারই প্রশংসা করবে।

নামের পর নাম। থামতেই চায় না লম্বু। হাঁপিয়ে উঠলেন যাজক।

লেজুড় হিসেবে এফারেন বলল, 'লন্ডনের সেন্ট পলের অর্গ্যানের সুনামও নস্যাৎ হয়ে যাবে তার আবিষ্কারটা কালফারমাট গির্জার অর্গ্যানে লাগানোর পর।'

ঠিক এই সময়ে ঘণ্টা-ঘরের ঘণ্টা বেজে ওঠায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যাজক।

এফারেন লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে চলে গেল ঘর থেকে, তার মোটা সঙ্গীর সন্ধানে।

*

অর্গ্যানের খবরটা হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে গেল গ্রামে। অর্গ্যান নির্মাতা এমন একটা যন্ত্র কালফারমাট অর্গ্যানে লাগাবে যে এবার থেকে সুরলহরীর মধ্যে অপূর্ব ভাবে ফুটে উঠবে বাচ্চা গাইয়েদের মিষ্টি স্বর।

অর্গ্যানের মেরামতের কাজ শুরু হলো পরদিন থেকে। আমরা অবসর সময়ে ভিড় করলাম মঞ্চে। দেখলাম, পুরো

অর্গ্যানকেসটাই খুলে ফেলে টুকরো টাকরা পার্টসগুলো ছড়িয়ে রাখা হয়েছে চারধারে।

অর্গ্যান মানেই তো বেশ কিছু নল, বায়ুর আধার, হাপর আর বায়ু নিয়ন্ত্রণের রেজিস্টারের সমন্বয়। পাইপের আস্ত জঙ্গল! স্কুল মাস্টার সহ গোটা স্কুলটাকে যেন ঢুকিয়ে দেয়া যাবে সেই জঙ্গলের মধ্যে!

চোখে কৌতূহল আর ভয় নিয়ে বিরাট যন্ত্রটার দিকে চেয়ে রইলাম আমরা। আমাদের মনে হলো এতদিন যেন মাটি চাপা ছিল এই যান্ত্রিক বিস্ময়; এফারেন এখন বোধহয় মাটি খুঁড়ে বের করে এনেছে চোখের সামনে।

হস্ট বলল, 'ঠিক যেন একটা স্টীম এঞ্জিন।'

'উঁহু,' তুলনাটা মনে ধরল না ফ্যারিনার, 'সারি সারি কামানের মতো। গানের তৈরি গোলা বেরোয় নলের মধ্যে থেকে।'

দুটো তুলনার কোনটাই মনে ধরেনি আমার। পাগলা ঝড়ের মত গানের গমক যখন বেরোতো নলগুলোর মধ্যে দিয়ে, সারা শরীর কেঁপে উঠত; ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুভব করতাম সেই বিচিত্র শিহরণ।

তন্ময় হয়ে থাকল এফারেন তার মেরামতির কাজ নিয়ে, আমাদের দিকে কোন মনোযোগই নেই। অর্গ্যানে বড় রকমের কোন গলদ অবশ্য ছিল না। দু'চারটে মামুলি মেরামতের কাজ আর বহুবছরের জমা ধুলো ঝেড়ে দেয়া। ব্যস, ঠিক হয়ে গেল বিশাল বাজনযন্ত্র। এবার লাগাতে হবে অনেকগুলো কৃস্টালের বাঁশি বসানো রেজিস্টার, এফারেনের সেই আশ্চর্য আবিষ্কার। বাচ্চাদের গলার রেজিস্টার।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা করল, কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারল না এফারেন। যন্ত্রের জঙ্গলে বৃথাই হাতড়ে গেল, কিন্তু

আবিষ্কারটাকে ঠিকমত লাগাতে পারল না। শেষকালে নিষ্ফল আক্রোশে চিৎকার করে উঠল সে ক্রুদ্ধ তোতাপাখির মত। পাখির মালিক পাখিকে উত্যক্ত করলে পাখি যেমন কটকট করে ভীষণ রাগে ডাক ছাড়ে, প্রায় সেভাবে সে মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে লাগল।

আমার প্রতিটি রোমকুপ দাঁড়িয়ে গেল। চিৎকার তো নয়, যেন কাছেই বজ্রবিদ্যুতের পতন ঘটেছে।

সেই থেকে কিরকম যেন হয়ে গেলাম। চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল বিশাল অর্গ্যানটা। যেখানেই থাকি না কেন, চুম্বকের মতো অর্গ্যান আমাকে টানে। বাচ্চাদের গলা ধরে রাখার অদ্ভুত বাক্সটাকে মনে হতো যেন একটা খাঁচা, বাচ্চারা যেন বন্দি হয়ে রয়েছে সেই খাঁচায়। অর্গ্যানের নলের জঙ্গলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম রাতে। সময় পেলেই প্রতিদিন ছুটে যাই অর্গ্যানের পাশে।

ঠকাং ঠকাং করে হাতুড়ি মেরে চলে এফারেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকি আমি। বেটি আমার উন্মনা ভাব লক্ষ করেছে। বলল, 'জোসেফ, আর যেয়ো না ওখানে।'

আমি কথা দিলাম, আর যাব না। তবুও রোজ যাই। প্রতিদিনই যাই। বাবা আর মাকে অবশ্য কিছু বলিনি। বললে ভাবত আমি পাগল হয়ে গেছি।

*

বড়দিনের আর মোটে সাতদিন বাকি। স্কুলঘরে উইলিয়াম টেল-এর একঘেয়ে গল্প শোনাচ্ছেন মাস্টার, এমন সময়ে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকলেন যাজক। তাঁর পেছনে এফারেন।

স্কুলে কেন অর্গ্যানের মিস্ত্রি? তাকে এখানে কেন আনলেন যাজক?

এফারেনের তীক্ষ্ণ চাহনির সামনে আমরা জবুথবু হয়ে গেলাম। লোকটা একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। চিনতে পেরেছে নিশ্চয়। অস্বস্তির বোধটা আরও বেড়ে গেল আমার।

যাজকের আসার উদ্দেশ্যটা সুস্পষ্ট হলো তাঁরই ব্যাখ্যায়। এফারেন বাচ্চাদের দিয়ে গানের আসর জমানোর ভার নিয়েছে। কয়্যার স্কুলে আমরা ষোলোজন গাইতাম। মাস্টার যখন বললেন, এই ষোলোজনের গলা একই রকম, প্রায় খেপে উঠল এফারেন। দুটো গলা কখনোই এক হতে পারে না। সমঝদারের কানে তফাৎ ধরা পড়বেই।

হকচকিয়ে গেলাম আমি। বেটি আর আমার গলা শুনে ধরা যেত না আমাদের একজন মেয়ে আরেকজন ছেলে। কিন্তু এফারেন যখন বলছে, তখন মেনে না নিয়ে উপায় কি!

ষোলোজনের আটজন ছেলে, আর আটজন মেয়ে। এফারেনের হুকুমে দু'লাইনে সামনে দাঁড়ালাম আমরা। এভাবেই দাঁড়াতাম কয়্যার স্কুলে এগলিস্যাকের নির্দেশে। আমাদের প্রত্যেকের জিভ টেনে দেখল এফারেন। গলার ভেতরে স্বরযন্ত্র আর ভোকাল কর্ড পর্যন্ত দেখে নিল যেন। গভীর শ্বাস নিতে হলো, ছাড়তেও হলো। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে এমনভাবে প্রত্যেককে পরীক্ষা করল লোকটা যেন আমরা মানুষ নই, এক একটা বাজনযন্ত্র। চাবী আঁটছে সুর ঠিক করার জন্যে। বেহালা নিয়ে বাদক যেমন করে।

পরীক্ষা শেষে আচমকা সে চেঁচিয়ে উঠল বাঁজখাই গলায়, 'চুপ সবাই! কান খাড়া করে শোনো। ফান্ডামেন্টাল সুরটা এবার বাজাচ্ছি। সব সুরের ভিত এই মৌলিক সুর।'

ভাবলাম এগলিস্যাকের মত বুঝি এবার U-এর মত একটা যন্ত্র বের করবে পকেট থেকে। লম্বা ডাণ্ডা কাঁপিয়ে দিলেই বেরিয়ে

আসবে ধৈবত সুর। কিন্তু আমাদের চমকে যেতে হলো পরের ঘটনায়।

কোন যন্ত্রই বের করল না এফারেন। মাথা হেঁট করে বুড়ো আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠকাস্ করে মারল সে নিজের শিরদাঁড়ার সবচেয়ে ওপরের হাড়ে, ভার্টেব্রায়। অমনি করোটির তলার সেই হাড় থেকে বেরিয়ে এল ধাতব শব্দ। ঠিক ধৈবত! আটশো সত্তরটা স্বাভাবিক কম্পন রয়েছে তার মধ্যে!

আশ্চর্য তো! লোকটার চব্বিশটা কশেরুকা কি অর্গ্যানের চব্বিশটা স্প-এর সঙ্গে এক সুরে বাঁধা?

'সব চুপ,' বলল এফারেন, 'এবার শুরু হোক গান।'

'সা' থেকে আরম্ভ করছে এফারেন। কয়্যার স্কুলে যতবার এই ষোলোজনে গেয়েছি, প্রত্যেকে একটা গলার আওয়াজই শুনেছে, ষোলোটা গলা নয়। কিন্তু এফারেন নাকি ষোলোটা গলা শুনতে পাচ্ছে!

মাথা ঝাঁকিয়ে ডাইনে বাঁয়ে অখুশি চাহনি হানল এফারেন, তারপর বলল, 'আবার গাও। একে একে গাও এবার। প্রত্যেকের নিজের সুর শোনাও। দেহের নিজস্ব সুর শুনতে চাই, যে সুর কয়্যারে বাজবে। অন্য কোন সুর নয়।'

দেহের নিজস্ব সুর! কথাটার মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। এফারেনের দেহের নিজস্ব সুরটা কি তা জানতে ইচ্ছে হলো!

ভয়ে ভয়ে শুরু করলাম প্রত্যেকে। অপমানিত হওয়ার ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। না জানি দেহের নিজস্ব সুর বলতে কি বোঝাচ্ছে এফারেন। সে সুর আবার একটাই হতে হবে। গলার মধ্যে সেই একটা সুরই বাজিয়ে যেতে হবে। ফুলের টবে যেমন বিশেষ ফুলের গাছের চাষ করা হয়, গলার মধ্যে সেই বিশেষ সুরের রেওয়াজ করতে হবে!

মহা সমস্যায় পড়লাম।

হষ্ট গাইল সবার আগে। সুর সপ্তকের সব কটা সুর গলার মধ্যে তোলার পর এফারেন রায় দিল, পঞ্চম সুরটাই তার দেহের নিজস্ব সুর। ব্যক্তিগত সুর ওটা। যে সুর সব চাইতে রোমাঞ্চ জাগায় গলার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার পর।

ফ্যারিনার পালা এল তারপর। দেখা গেল, শুদ্ধ ধৈবত তার দেহের নিজস্ব সুর।

এভাবে একে একে সবাইকে বাজিয়ে নেয়ার পর প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সুরে বেঁধে দিল এফারেন।

শেষে পালা এল আমার।

'দেখি, বাছা, তোমার মাথাটা!' বলে এমন ভাবে আমার মাথাটাকে সামনে পেছনে মোচড়াতে লাগল এফারেন, যেন বাদ্যযন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে প্যাঁচ কষছে। ঘাড় থেকে মাথা না খুলে যায়। 'নাও, এবার ধরো। দেখি তোমার দেহে কি সুর জাগে।'

'সা' থেকে আরম্ভ করে আবার 'সা'য়ে ফিরে এলাম। এফারেন খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। আবার শুরু করতে হলো ষড়জ থেকে ষড়জ। আবার...আবার। কিছুতেই পছন্দ হলো না এফারেনের। বিষম দমে গেলাম; কয়্যার স্কুলের সেরা গাইয়ে আমি, আর আমার দেহের নিজস্ব সুরই নেই!

তিতকুটে গলায় বলল এফারেন, 'ক্রোম্যাটিক স্বরগ্রামে গাও তো, বাছা। মনে হচ্ছে ওর মধ্যেই পাব তোমার নিজের সুর।'

আধটা করে স্বর বাদ দিয়ে গলা খেলিয়ে গেলাম অক্টেভের শেষে।

'পেয়েছি। পেয়েছি। পেয়েছি তোমার সুর। আগাগোড়া এই সুরই বাজবে তোমার গলায় গানের সময়ে, কেমন?'

'সুরটার নাম?' জিজ্ঞেস করলাম আমতা আমতা করে।

'অতি কোমল গান্ধার।'

সেই থেকে একটানা অতি কোমল গান্ধারই গেয়ে গেলাম আমি।

খুশি হলেন যাজক আর মাস্টার সাহেব।

'এবার মেয়েদের পালা।'

মনে মনে ভাবলাম, বেটিও নিশ্চয় অতি কোমল গান্ধার হবে। আমাদের দু'জনের গলা তো একই রকম।

একে একে মেয়েদের যাচাই করে নেয়ার পর কারও মধ্যে পাওয়া গেল শুদ্ধ নিষাদ, কারও মধ্যে শুদ্ধ গান্ধার। বেটির পালা আসার পর বেচারী ভয়ে কাঁপতে লাগল এফারেনের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমারই মতো একই হাল হলো তারও। হাজার বার গলা খেলিয়েও নিজস্ব সুর বের করতে না পেরে তাকে গাইতে হলো ক্রোম্যাটিক স্বরগ্রামে। পাওয়া গেল অনু কোমল গান্ধার। ওটাই ওর দেহের নিজস্ব সুর।

মনটা প্রথমে খিঁচড়ে গিয়েছিল। তারপরে পটাপট হাততালি দিয়ে উঠলাম পরমানন্দে। মন্দ কী! আমার অতি কোমল গান্ধার, বেটির অনু কোমল গান্ধার।

হাততালি শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেল এফারেনের, বেশ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, অত ফুর্তি কিসের?'

সাহসে বুক বেঁধে বললাম, 'কি মজা! আমার আর বেটির একই সুর!'

'এক সুর!' যেন মহা ক্ষ্যাপা খেপে গেল এফারেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হলো তার মাথা যেন গিয়ে ঠেকেছে কড়িকাঠে। বলল, 'এক সুর কিসের! অতি কোমল গান্ধার আর অনু কোমল গান্ধার এক সুর হলো? কানগুলো কি গাধার কান? উজবুক গর্দভ কোথাকার!' যাজকের দিকে তাকাল। 'আপনি কিছু

বলুন! আপনার কি তাই ধারণা?' মাস্টারের দিকে চোখ ফেরাল। 'মাস্টার, আপনার ধারণাও নিশ্চয় তাই? এই যে বুড়ি ভদ্রমহিলা, আপনিও নিশ্চয় তাই মনে করেন?'

বুড়ি ভদ্রমহিলা সম্বোধন করেছে সে মাস্টার সাহেবের আইবুড়ি বোনকে। আর যায় কোথায়! তাঁর মেজাজ তো আমি জানি। খপাৎ করে একটা দোয়াত খামচে ধরলেন তিনি। মতলব ছিল এফারেনের মাথায় ছুঁড়ে মারা। অতি কষ্টে সামলে নিলেন নিজেকে।

'স্বরবিরতিও কাকে বলে জানা নেই? একই সুরের এক অষ্টমাংশ তফাৎ রয়েছে অতি কোমল গান্ধার আর অনু কোমল গান্ধারের মধ্যে। অতি কোমল নিষাদ আর অনু কোমল নিষাদের মধ্যে। এটুকুও কি ধরা পড়ে না কালফারমাটের মানুষদের মোটা কানে? কেউ কি নেই এখানে যে সুরের আটভাগের প্রতিটা ভাগের তফাৎ ধরতে পারে?'

নিথর হয়ে রইল ঘরশুদ্ধ সবাই, যেন নড়তেও সাহস হচ্ছে না কারও। এফারেনের তিক্ত গলাবাজিতে ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল জানালার কাঁচ। মরমে মরে গেলাম আমি এই পরিস্থিতি আমার কারণে সৃষ্টি হওয়ায়। মনটাও খারাপ হয়ে গেল বেটি আর আমার সুরে তফাৎ আছে জেনে। হোক তা এক অষ্টমাংশ সুর, তবুও তারতম্য তো রয়েছে। আড়চোখে আমার পানে চেয়ে রইলেন মাস্টার সাহেব আর যাজক।

কেন কে জানে, আচমকাই ঠাণ্ডা মেরে গেল এফারেন। অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলল, 'অ্যাটেনশন! এবার সবাই মিলে ধরো নিজের নিজের স্বরগ্রামের সুর!'

সবাই আমরা সুর অনুযায়ী সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম গান ধরতে। বেটি দাঁড়াল আমার ঠিক আগে, কারণ সে অনু কোমল

গান্ধার আর আমি অতি কোমল গান্ধার। ফলটা হলো এই, ষোলোটা ছেলেমেয়ে যেন অর্গ্যানের ষোলোটা পাইপ হয়ে গেলাম। জীবন্ত অর্গ্যান যেন। প্রত্যেকের গলায় এবার বাজবে একেকটা পাইপের একেকটা সুর!

হুঁশিয়ার করে দিল এফারেন, 'ক্রোম্যাটিক স্বরগ্রাম। খেয়াল থাকে যেন। ভুল হলেই...'

ভুল হলে যে কি হবে, তা আর বলার দরকার ছিল না। যার গলায় সা বাঁধা হয়েছে, সে শুরু করল সবার আগে। তারপর রে। বেটি গাইল অনু কোমল গান্ধার। আমি অতি কোমল গান্ধার। তফাৎটা ধরতে পেরে যেন খুশি হলো এফারেন। স্বরগ্রাম বরাবর ওঠানামা করলাম পর পর তিনবার।

খুশি খুশি গলায় এফারেন বলল, 'চমৎকার! তোদের দিয়ে এবার জ্যান্ত বাজনা বাজানো যাবে। তোরাই হবি অর্গ্যানের জীবন্ত চাবি!'

যাজক সাহেবের বোধহয় বিশ্বাস হলো না। মাথা নাড়লেন মৃদু।

খেয়াল করেছে এফারেন, খানিকটা রাগের সঙ্গেই বলে উঠল, 'কেন হবে না বলতে পারেন? বেড়ালের লেজে চিমটি কাটলে মিয়াউঁ মিয়াউঁ আওয়াজ বেরোয় না? আমিও আওয়াজ বের করব সেভাবে। বেড়াল পিয়ানো! বুঝলেন? বেড়াল পিয়ানো!' বলতে বলতে যেন আনন্দে বিভোর হয়ে গেল অদ্ভুত লোকটা!

হেসে ফেলেছিলাম আমরা। এফারেনের কথার গুরুত্ব তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম। বেড়ালের লেজে যান্ত্রিক টিপুনি দিয়ে যে বেড়াল পিয়ানো উদ্ভাবিত হয়েছে, এই কথায় সত্যতা ছিল।

সত্যিই আশ্চর্য এক আবিষ্কার এ!

মাথায় টুপি পরতে পরতে হুঁশিয়ার করে দিলো এফারেন,

'নিজের নিজের সুর খেয়াল থাকে যেন। বিশেষ করে তোদের বলছি, অতি কোমল গান্ধার আর অনু কোমল গান্ধার, খবরদার, দেহের সুর ভুলে যাসনে তোরা।'

সেই থেকেই ওই নামটাই টিকে গেল আমার আর বেটির।

*

এফারেনের কালফারমাট স্কুল পরিদর্শন গভীর ছাপ এঁকে গেল আমার মনের মধ্যে। সেই থেকে সব সময়ে মনে হত যে অতি কোমল গান্ধার বেজে চলেছে আমার গলার ভেতরে, দেহের সুরের রেওয়াজ চলেছে সর্বক্ষণ।

আর দেরি নেই বড়দিনের। আর মাত্র সাত দিন। অর্গ্যানের কাছেই থাকতে হচ্ছে আমাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। আমার তখনকার সেই অনুভূতি বড় গভীর দাগ ফেলল মনের মধ্যে।

এফারেন আর তার সঙ্গীকে সাধ্য মতো সাহায্য করতাম বটে, কিন্তু দু'জনের পেট থেকে একটা কথাও খসাতে পারতাম না। রেজিস্টার এখন নিখুঁত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। অর্গ্যানকেস নতুনের মত ঝকঝক করছে। চক চক করছে ধাতব অংশগুলো।

উৎসবের জন্যে তৈরি আমরা। কিন্তু অভাব রয়ে গেছে একটা ব্যাপারে। বিখ্যাত সেই শিশুকণ্ঠে ভরপুর যন্ত্রটি এখনও লাগেনি অর্গ্যানে।

চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি এফারেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু যন্ত্র যেমন নিরব ছিল তেমনি রয়েছে। রেজিস্টারে গলদটা কোথায়, আমি তো বুঝতে পারিইনি, এফারেনও পারেনি।

তার নৈরাশ্য শেষে বদমেজাজে পরিণত হয়েছে। দোষটা নাকি অর্গ্যানের, হাপরের। তবে সব চেয়ে বেশি ঝাল ঝেড়ে গেল সে এই বেচারা অতি কোমল গান্ধারের ওপর।

আমি কি করব? মাঝে মাঝে মনে হতো, রাগের মাথায় দুমদাম করে ভেঙেচুরে না দেয় এফারেন গোটা অর্গ্যানটা। ভয়টা মনে এলেই সামনে যাতে না থাকতে হয় সেজন্যে ভেগে যেতাম আমি।

কালফারমাটের লোকজনের এতো আশা শেষ পর্যন্ত কি অপূর্ণ থেকে যাবে? শুধু একটা শিশুকণ্ঠ উদগীরণ করা যন্ত্রের গলদে? তরী ডুববে ঘাটে এসে? এতো আয়োজন, এতো মহড়া, এতো তোড়জোড় বিফলে যাবে শুধু ওই অদ্ভুত বাক্সটার বেয়াড়াপনার জন্যে?

তবে বড়দিনে বাজনা বাজবে ঠিকই, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু শুধু অর্গ্যানের বাজনা। গান আর হবে না। কয়্যারের ছেলেমেয়েদের তালিম দেয়াই বৃথা যাচ্ছে!

বড়দিন এসে গেল। এফারেনের মেজাজ এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে ভয়ের চোটে অর্গ্যানের ধারে কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম আমি। বুঝলাম না, সত্যি সত্যিই শিশুকণ্ঠের যন্ত্রের বেয়াড়াপনায় ছোটদের গানের আসর শিকেয় তুলে রাখবে কিনা এফারেন।

ভয়ের কারণে খোঁজ নিতে গির্জায় যাওয়াও ছেড়ে দিলাম আমি।

বড়দিনের আগের দিন ছোটদের সন্ধেতেই বিছানায় শুয়ে পড়তে হয়, যাতে মাঝরাতের স্তোত্রপাঠে অংশ নিতে পারে। সেদিনও স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে ভয়ে ভয়ে বেটি বলল, 'জোসেফ, প্রার্থনা-বইটা সঙ্গে নিতে ভুলো না যেন।'

বাড়ি গেলাম। বাবা-মা জোর করে শুইয়ে দিল বিছানায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম এফারেনকে। আমার বিছানার চারধারে যেন শুধু ঘুরছে। লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে খাটে হাত বোলাচ্ছে। বৃথাই বালিশের তলায় মুখ লুকোলাম, এফারেন

অদৃশ্য হলো না চোখের সামনে থেকে।

জানি না কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। আচমকা ঘুম ভাঙল। ঘাড় ধরে কে যেন ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

এফারেনের গলা শুনলাম কানের কাছে, 'অতি কোমল গান্ধার, উঠে আয়! মাঝরাতের স্তোত্রপাঠে যাবি না?'

বিমূঢ় হয়ে গিয়েছি আমি, মাথায় কিছু ঢুকল না।

'কি রে, টেনে নামাতে হবে নাকি?'

গায়ের চাদর একটানে ছিটকে গেল। চোখের পাতা মেলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল উজ্জ্বল আলোয়। লণ্ঠন হাতে সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে এফারেন।

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম আমি।

'জামাকাপড় পরে নে, অতি কোমল গান্ধার।'

'জামাকাপড় পরব?'

'তবে কি ঘুমাবার পোশাক পরেই স্তোত্রপাঠ করবি?'

দ্রুত জামাকাপড় পাল্টে নিলাম আমি। সাহায্য করল এফারেন।

'ঘণ্টা শুনছিস্?'

সত্যিই নিশী রাতের অন্ধকার বুক চিরে ঢং ঢং করে বাজছে গির্জার ঘণ্টা।

লণ্ঠন তুলে নিয়ে এগোল এফারেন, 'চলে আয়।'

'বাবা-মা?'

'চলে গেছে আগেই।'

অদ্ভুত কাণ্ড তো! আমাকে ঘুমন্ত রেখে বাবা-মা গির্জায় চলে গেছে!

নেমে এলাম নিচে। সদর দরজা খোলা। বেরিয়ে এসে ভিড়িয়ে দিলাম।

বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। আকাশে ঝকঝক করছে হাজারো তারা। দূরে দেখা যাচ্ছে গির্জার চুড়ো। ঘণ্টা ঘরের মাথাটা গিয়ে ঠেকেছে যেন নক্ষত্রলোকে।

এফারেন হনহন করে হাঁটছে, আর মাঝে মাঝে একেকটা বাড়ির সামনে দাঁড়াচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে অমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে হয় একটি ছেলে, নয় একটি মেয়ে। কয়্যার স্কুলের ছেলেমেয়ে। দেখতে দেখতে ষোলোজন হলাম আমরা। এই ষোলোজনের দেহের নিজস্ব সুর আবিষ্কার করেছে এফারেন।

গির্জার সামনে পৌঁছোলাম। ভেতরে ঢুকলাম পাশের ছোট দরজা দিয়ে। ঘুটঘুটে আঁধারের মাঝ দিয়ে পৌঁছোলাম অর্গ্যানমঞ্চে। আলো জ্বলছে সেখানে। কীবোর্ডের ঢাকনি খোলা। বাতাসে ফুলে রয়েছে হাপর। অর্গ্যানকেস খোলা হতেই আমরা ষোলোজন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়লাম যে যার জায়গায়। কিছু বলতে হলো না, বন্ধ হয়ে গেল অর্গ্যানকেস আমাদের ভেতরে নিয়ে।

এফারেনের মতলব বোঝা গেল। এই আইডিয়াই গোড়া থেকে ছিল ওর মাথার মধ্যে। অর্গ্যানের ষোলোটা পাইপে বন্দী আমরা ষোলোজন। হাপর থেকে বাতাস যখন ঢুকবে পাইপে, গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে দেহের নিজস্ব সুর। জীবন্ত বাজনা বাজবে অর্গ্যানে। শিশুকণ্ঠের স্বরে ভরপুর যন্ত্র বলতে বুঝিয়েছে সে এই যন্ত্রকেই। বেড়ালের লেজে চিমটি কাটার মতোই বাতাসের ঠেলায় হাঁসপাঁস করে আমরা গলা ছেড়ে গাইব গান। যে যার সুরে। চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে আশ্চর্য সংগীত।

ভাগ্য ভাল, অতি কোমল গান্ধারের স্থান পঞ্চমে, বেটির ঠিক পাশেই। অনু কোমল গান্ধার বলে সে দাঁড়িয়েছে চতুর্থ পাইপে। ফিস ফিস করে বললাম, 'বেটি, আছো তো?'

'হ্যাঁ, জোসেফ।'

'ভয় নেই, তোমার পাশেই আছি।'

'চোপ!' খিঁচিয়ে উঠল এফারেন। চুপ মেরে গেলাম আমরা।

*

ঘণ্টা বেজে চলেছে। গির্জায় চেয়ার টানাটানির আওয়াজ হচ্ছে। হল ঘর ভরে উঠছে একটু একটু করে।

বাবা আর মাকে দেখতে পেলাম নির্দিষ্ট জায়গায় বসে আছে একেবারে নির্বিকার হয়ে। অবাক হয়ে গেলাম। এত নির্বিকার উদাসীন রয়েছে কি করে!

ষোলোজন ছেলেমেয়েদের একজন বাবা-মাও কি জানে না তাদের ছেলেমেয়েরা এখন কোথায়? এ খাঁচা থেকে আর কি মুক্তি পাব? নিষ্ঠুর এফারেন আজ রাতে গানের আসর শেষে আর কি আমাদের ছেড়ে দেবে?

সাঙ্গ হলো একটার পর একটা স্তোত্রপাঠ। অনুষ্ঠান সূচি মাফিক চলছে সব। সবার শেষে এলো ছেলেমেয়েদের মহান সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। এ গান এমনই গান যার রেশ গিয়ে পৌঁছোবে স্বর্গে, ম্লান করে দেবে অন্যান্য সব অনুষ্ঠান—স্তোত্র পাঠ, প্রার্থনা সংগীত ও আর যা কিছু আছে।

অর্গ্যান পাইপের মধ্যে কাঠ হয়ে রইলাম। একটা শুকনো শব্দ শুনলাম সবার আগে। শিশুকণ্ঠে ভরপুর রেজিস্টারে বাতাস ঢুকছে, এ তারই শব্দ। মিষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ শব্দ আছড়ে পড়ছে গির্জার খিলান থেকে খিলানে। হক্টের পঞ্চম শুনলাম, ফ্যারিনার ধৈবত শুনলাম, তারপরেই আমার প্রিয় পার্শ্ববর্তিনীর অনু কোমল গান্ধারও শুনলাম। পরক্ষণেই নিষ্ঠুর হাতে সুনিয়ন্ত্রিত বাতাসের স্রোত ঢুকল পায়ের তলা দিয়ে আমার পাইপে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল অতি কোমল গান্ধার। মুখ বন্ধ রাখতে চাইলাম, কিন্তু

পারলাম না। অর্গ্যানবাদকের হাতে আমি একটা নিছক যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নই। অর্গ্যানের চাবি ছুঁয়ে সে খুলে দিয়েছে আমার অন্তরের গানের কল...

কি যে বেদনাময় বর্ণনার অতীত সে যন্ত্রণার অনুভূতি, তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। বেশ বুঝলাম, এই নিপীড়ন বেশিক্ষণ চললে গলা দিয়ে আর গানের সুর বেরোবে না, বেরোবে কাৎরানি–যন্ত্রণাবিকৃত ভয়াবহতায় ভরা করুণ আর্তনাদ! কড়ি মধ্যম, অনু কোমল নিষাদ, শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ ধৈবত সব যেন নিঃসীম বেদনার ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে যেতে লাগল আমার মগজের মধ্যে। অতি কোমল গান্ধার শব্দের ঝড়ে দিশেহারা হয়ে হারিয়ে ফেললাম অনু কোমল গান্ধারকেও!

নিষ্ঠুর, নির্দয়, নির্মম আঙুলের চাবি টেপা কিন্তু স্থগিত হলো না। দমকে দমকে হাওয়ার ঝাপটায় অবর্ণনীয় কষ্টে তালগোল পাকিয়ে গেল আমার মগজ, একটু একটু করে লোপ পেতে লাগল সচেতনতা। সংজ্ঞাহীনতার প্রান্তে পৌঁছে অনুভব করলাম আমি মারা যাচ্ছি...শেষ নিঃশ্বাসের আর দেরি নেই।

বাজনার বারোটা বাজা তাহলে আসন্ন। অতি কোমল এই গান্ধারের মৃত্যু হলে বিখ্যাত এই সংগীত বেতাল হবেই!

'জোসেফ। জোসেফ।'

'অ্যাঁ! অ্যাঁ!'

'হাঁ করে কি দেখছিস? আর কত ঘুমোবি? গির্জায় যেতে হবে না? স্তোত্র পাঠে না থাকলে রাতের খাওয়া বন্ধ, মনে থাকে যেন।'

ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। স্বপ্ন দেখেছি তাহলে। কিন্তু একী স্বপ্ন? গলার মধ্যে যে এখনও ব্যথা করছে। ঢোক গিলতে গেলে লাগছে। সুরের যন্ত্রণার রেশ কাটেনি মাথার মধ্যে থেকে।

জামাকাপড় পরে নিলাম তাড়াতাড়ি। শুনলাম, নিঝুম রাতের

নিরবতা ভেঙে দিয়ে গির্জায় ঘণ্টা বাজছে। মা আগেই চলে গিয়েছে। আমাকে নিয়ে বাবা পৌছোল যখন, তখন গ্রামের সবাই উপস্থিত হয়েছে হল ঘরে।

শুরু হয়ে গেল অনুষ্ঠান। কিন্তু অর্গ্যান বাদ! অর্গ্যান আর বাজবে না। কেন? পাহারাদার উঠে গেল অর্গ্যান মঞ্চে। এফারেন পালিয়েছে। সঙ্গে গেছে তার মোটা বন্ধু। শিশুকণ্ঠে ভরপুর যন্ত্র চালু করতে না পেরে লাঞ্ছনা এড়াতে ভেগে গিয়েছে ওরা গ্রাম ছেড়ে। অর্গ্যান মেরামতের পারিশ্রমিক পর্যন্ত নেয় নি।

তাতে আর কেউ দুঃখ পেলেও আমি মোটেই পাইনি। গলার ব্যথা তখনও ভুলিনি আমি। সেই কষ্টের অভিজ্ঞতা ভোলা যায় না। ওই অবস্থা আর কিছুক্ষণ চললে আমাকে পাগলা গারদে কাটাতে হত বাকি জীবনটা।

পাগলাগারদের পরিবর্তে পেলাম সুখের সংসারের গারদ। তবে সে দশ বছর পরে। বিয়ে হয়ে গেল অতি কোমল গান্ধারের সঙ্গে অনু কোমল গান্ধারের। সুরের এক অষ্টমাংশ তফাৎ নিয়েও সেই থেকে আমরা পরম সুখে আছি।

থাকবও।

ইটারন্যাল অ্যাডাম

এক

পেছনে দু'হাত, একটানা পায়চারি করছেন ভদ্রলোক। মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। মানবজাতির দুর্বোধ্য ইতিহাস নিয়ে ভাবছেন তিনি।

ধাঁধায় পড়ে গেছেন তিনি। পণ্ডিত ব্যক্তি। পৃথিবীর গোটা ইতিহাসই তাঁর জানা। তবুও এই মুহূর্তে অনেক রহস্যের সমাধান করতে পারছেন না।

তিনি যে সময়কার মানুষ, তার কাছাকাছি সময়ের ইতিহাস তিনি জানেন। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস। অল্প জায়গায় বেশি মানুষের স্থান হওয়া নিয়ে সংঘর্ষের ইতিহাস।

বার্লিন থেকে কেপহর্ন এই সামান্য জায়গাটা নিয়ে গত আট হাজার বছর কম লড়াই হয়নি। ডাঙা বলতে আছেই শুধু ওইটুকু। বাকি সব পানি। সাগর ঘিরে রেখেছে গোটা পৃথিবীটাকে।

আটহাজার বছরের ইতিহাসে কেবলই রক্ত ঝরার কাহিনী। আমাদের ইতিহাসবিদ্ ভদ্রলোক যে রাজ্যের নাগরিক, তার একশো পঁচানব্বইতম বার্ষিকী উদযাপিত হলো এই কিছু দিন আগে। রাজ্যের নাম 'চার সাগরের দেশ'।

এদেশের চারদিকে সাগর। আর কোথাও ডাঙা বলতে কিছু নেই।

আট হাজার বছর ধরে এই দেশটায় মানুষজাতি লড়ে চলেছে এক নাগাড়ে।

প্রথমে দু'জনের হাতাহাতি, তারপর দশজনের, তারপর পরিবারে পরিবারে, দেশে দেশে।

লড়াইয়ের এই ইতিহাসটাকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়। মোটামুটি তিনটি জাত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল শেষের দিকে। তাদের মধ্যে একটা জাত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠল, হারিয়ে দিল বাকি দুটো জাতকে।

প্রায় দুশো বছর আগেকার কথা সেসব। রক্তে ভেসে গেছে মাটি। লড়াইয়ের পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে জারগটদের একচ্ছত্র রাজ্য—'চার সাগরের দেশ'।

*

আমাদের ইতিহাসবিদ ভাবছেন, কিভাবে এই আট হাজার বছরের মানুষ জাতটা এগিয়ে চলেছে একটু একটু করে। প্রথমে লিখতে শিখল তারা। তারপর প্রায় শ'পাঁচেক বছর আগে এক রকম ছাঁচ তৈরি করে একই লেখার অনেকগুলো প্রতিলিপি তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। এক চিন্তাকে অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শিখল মানুষ।

একে একে এলো কয়লা, স্টীম, মেশিন। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে আবিষ্কার হলো বিদ্যুৎ।

কিন্তু মূল প্রশ্নের এখনও সমাধান হয়নি। মানুষ এই দুনিয়ার মালিক। কিন্তু কে এই মানুষ? কোথা থেকে আসে? যায়ই বা কোথায়?

ভূতত্ত্ব থেকে কিছু উত্তর অবশ্য পাওয়া গেছে। মাটি পরীক্ষা

করে জানা গেছে, পৃথিবীর মোট বয়স। চার সাগরের এই দেশ প্রথমে ছিল পানির তলায়। মাটির ধরন দেখেই বোঝা গেছে, সমুদ্রের তলা থেকে ওপরে উঠে এসেছে দেশটা।

কিন্তু কিভাবে? কোন্ শক্তি অথই পানির গভীর থেকে ঠেলে তুলে দিয়েছে এতবড় দেশটাকে? পাহাড়ের গায়ে সামুদ্রিক পাললিক মাটির স্তর পরীক্ষা করে জানা গেছে এমনি আরও অদ্ভুত তত্ত্ব।

মানুষ, পশু, গাছপালা—সবকিছুরই উৎপত্তি সাগর থেকে। পানি থেকে ডাঙায় উঠেই সামুদ্রিক গাছপালা ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়েছে মাটির সঙ্গে। নিজেরা বেঁচেছে, বাঁচিয়েছে অন্যান্য প্রাণীকেও। কিন্তু কিছু প্রাণী আর গাছকে কোনমতেই সাগরের প্রাণী বা গাছের সমগোত্রীয় বলা চলে না। এরা যেন সৃষ্টি ছাড়া, সাগরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই।

দিশেহারা হয়ে পড়েছেন আমাদের ইতিহাসবিদ এই সমস্যা নিয়ে। এরা তাহলে এলো কোথা থেকে?

ভূতত্ত্ববিদরা বলেছেন, পৃথিবীর সব ডাঙাই নাকি এককালে পানির তলায় ছিল। পানি থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি।

কিন্তু অদ্ভুত ওই মাথার খুলিগুলো তাহলে এলো কোথা থেকে? তারাও কি পানির তলায় ছিল?

মাটি খুঁড়তে গিয়ে খুলিগুলো পাওয়া গেছে। মানুষের খুলি, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিভিন্ন সাইজের খুলি। কোনটা আকারে ক্ষুদ্র, ধড়ের কঙ্কালটা সে তুলনায় বেশ বড়, আবার কোন খুলি আকারে ধড়ের তুলনায় বড়। নতুন খুলিগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট। অর্থাৎ পুরোনো খুলিতে মস্তিষ্কের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েছে। তার মানে, অতীতের মানুষ কি আজকের মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল?

কোন সন্দেহ নেই তাতে। পুরাকালের মানুষেরা সত্যি অনেক

বেশি বুদ্ধিমান ছিল।

কিন্তু তাহলে তো বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যে হয়ে যায়। পুরোনো খুলিগুলোর বয়স নির্ণয় করে দেখা গেছে সেগুলো পঞ্চাশ হাজার থেকে বিশ হাজার বছর আগেকার। সেই সময় মানুষ কতখানি সভ্য হয়েছিল, তার ইতিহাস কোথাও নেই!

বিশ হাজার বছরের কথা ধরলেও মাথা ঘুরে যায়। তখনকার দিনের মানুষ যে জ্ঞানে-গুণে জারগটদের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ছিল, এ কথা ভাবতে গেলে বিস্ময় বোধ হয়।

কিন্তু কোথায় গেল সেই সভ্যতা? চল্লিশ হাজার বছর আগে যারা পৃথিবী জুড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, তাদের অস্তিত্ব? কোথায় সেই ইমারত, কলকব্জা, উন্নত সভ্যতার নিদর্শন? নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? সেই কারণেই কি জারগটদের পূর্বপুরুষেরা নতুন করে লিখতে শিখেছে, বাষ্পচালিত মেশিন আবিষ্কার করেছে, আবার সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন সভ্যতার?

অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! বরং অলৌকিক শক্তিতত্ত্বকে বিশ্বাস করা যায় আরও সহজে। প্রচণ্ড একটা শক্তি, যে শক্তির দাস এই বিশ্ববক্ষাণ্ড, সৃষ্টি করেছিল প্রথম মানব 'হেডম' আর প্রথম মানবী 'হিভা'। তাদের বংশধররাই আজ এই পৃথিবীর বাসিন্দা। কিন্তু 'হেডম' আর 'হিভা' শব্দ দুটো এলো কোথা থেকে? জারগটদের ভাষায় তো এই তত্ত্ব নেই?

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এমনি নানা বিস্ময় ধরা পড়েছে। সামুদ্রিক মাটির স্তরে স্তরে সঞ্চিত যুগযুগান্তরের বিস্ময় মাথা ঘুরিয়ে ছেড়েছে জারগটদের। একেক যুগে একেক রকম সভ্যতার নিদর্শন উঠে এসেছে ভূ-গর্ভ থেকে।

এ কি করে সম্ভব? একই জায়গাটা এতগুলো সভ্যতার উত্থান-পতন, সৃষ্টি-প্রলয় কি করে সম্ভব? প্রকাণ্ড স্তম্ভ, সুদৃশ্য মর্মর

মূর্তি, কারুকার্য খচিত পাথর, অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্র; বিচিত্র হরফ–অতি উন্নত সভ্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন উঠে এসেছে মাটির তলার নানা স্তর থেকে।

বিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে এই মাটিতেই তাহলে মানুষ সভ্যতার তুঙ্গে উঠে বসেছিল?

কিন্তু এদেশ তো ছিল পানির তলায়!

তাহলে?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল আমাদের ইতিহাসবিদের। দিনের আলো এখনও ফুরোয়নি। হাঁটতে হাঁটতে বাগানের পেছন দিকটায় চলে এলেন তিনি। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে এখানে। দু'দিন পরেই সুবিশাল একটা ল্যাবরেটরি গড়ে উঠবে এখানে।

এলোমেলো ছড়ানো রাজমিস্ত্রীদের যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে ছিলেন জারগট। ভাবছিলেন, কাজ শেষ হবে কদ্দিনে। এমন সময় পড়ন্ত রোদের আবছা আলোয় গহ্বরটা চোখে পড়ল তার।

উৎসুক হলেন জারগট। গহ্বর দেখে নয়, গর্তের মধ্যে আধখানা মাটি চাপা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে।

গর্তে নেমে জিনিসটা টেনে আনলেন তিনি। একটা কৌটো। বিচিত্র ধাতু দিয়ে তৈরি। এ ধাতুর চেহারাও কখনও দেখেননি তিনি। ধোঁয়াটে রং, দানা দানা চেহারা। অনেকদিন মাটি চাপার ফলে চেকনাই হারিয়েছে। চিড়ও খেয়ে গেছে কয়েক জায়গায়। ফাটা জায়গা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরে আরেকটা কৌটো।

এমনিতে খুলতে না পেরে জোর করতে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাপে গুঁড়িয়ে গেল অজ্ঞাত ধাতুর কৌটো। ওটা এতোই পুরোনো যে ধাতুর আর কিছু ছিল না ওটায়।

ভেতরের কৌটো থেকে বের হলো একটা হলুদ পাণ্ডুলিপি।

খুদে খুদে হরফে সুন্দর করে কি যেন লেখা রয়েছে তাতে। হরফগুলো অদ্ভুত। জীবনে দেখেননি আমাদের ইতিহাসবিদ-আর্কিওলজিস্ট।

আবিষ্কারের উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন তিনি, কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলেন ল্যাবরেটরিতে, মূল্যবান দলিলটা বিছিয়ে বসলেন টেবিলে। বেশ বোঝা যায়, কেউ তার মনের কথা পাতার পর পাতা লিখে গেছে। কিন্তু এ ভাষা তো মানুষ কোনদিন দেখেনি!

শুরু হলো তাঁর গভীর গবেষণা। এক বছর, দুই বছর করে পার হয়ে গেল অনেকগুলো বছর। সাধনায় কি না হয়! পণ্ডিত মানুষটির একাগ্র সাধনাও বৃথা গেল না। অতীত ভাষার মূল সূত্রটা ধরে ফেললেন তিনি।

এবার একেবারেই সহজ হয়ে গেল কাজটা। দলিল পড়তে আর কোন অসুবিধা হলো না। শুধু পড়েই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, অনুবাদও করে ফেললেন নিজের ভাষায়।

এতোক্ষণ বললাম ভূমিকা এবার বলছি সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী।

দুই

চব্বিশে মে, ২... সাল। রোজারিয়ো।

শুরু করব কিভাবে তা ভেবে পাচ্ছি না। ঘটনার শুরু তো অনেক আগে থেকেই। এতোদিন মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। তাই ঠিক করেছি লিখে রাখব। কিন্তু কিভাবে? ডায়েরী লেখার কায়দায় বরং লেখা যাক।

কিন্তু সমস্যা হয়েছে, কি ভাষায় লিখব? ইংরেজি আর স্প্যানিশ বলতে পারি গড়গড় করে। তবে একাহিনী মাতৃভাষায় লেখাই ভাল। তাই ফরাসি ভাষাতেই লিখছি।

জাতে আমি ফরাসি। টাকা রোজগার করতে এসেছি মেক্সিকোয়। একটা রূপোর খনির মালিক আমি। প্রচুর টাকা কামিয়েছি। ইচ্ছে আছে, জমানো অর্থ নিয়ে বুড়ো বয়সে স্বদেশে ফিরে যাব।

রোজারিয়ো জায়গাটা সাগরের উপকূলে। পাহাড়ের গায়ে আমার ভিলা। ভারি চমৎকার। যেন দক্ষ শিল্পির সযত্ন হাতে আঁকা ছবির। সাজানো গোছানো।

আমার জমির আঙুর বাগানটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাগরবেলায়। একশো গজ উঁচু একটা খাড়া পাথরের মাথায় গিয়ে শেষ হয়েছে আমার বাগান। ওপরে দাঁড়িয়ে নিচের উন্মনা উত্তাল সাগরকে দেখতে অদ্ভুত মোহময় লাগে।

ভিলার পেছনে দেড় হাজার গজ ওপরে উঠে গেছে চুড়ো পর্যন্ত। মোটরে চেপে কতবার যে চুড়োয় উঠেছি! দামি গাড়ি আমার পঁয়ত্রিশ হর্স পাওয়ার এঞ্জিন। এ গাড়িতে চড়ার আনন্দই আলাদা।

ভিলায় থাকি আমার পঁচিশ বছরের ছেলে জাঁ, পালিত কন্যা হেলেন আর চাকরবাকর নিয়ে। মনে মনে ইচ্ছা ছিল, হেলেনকে পুত্রবধূ করব যথাসময়ে।

চব্বিশ তারিখে সবাই বসে গল্প করছি বাগানে বসে। চারদিকে ঝলমল করছে ইলেকট্রোজেনিক আলোর ছটায়। মান্যগণ্য অতিথিদের মধ্যে রয়েছেন কিছু অ্যাংলো স্যাক্সন আর কিছু মেক্সিকান। মোট পাঁচজন অতিথি।

তাঁদের মধ্যে ডক্টর বাখুর্স্ট প্রথম দলে পড়েন, মানে অ্যাংলো

স্যাক্সন। ডক্টর মোরেনো দ্বিতীয় দলে, মানে মেক্সিকান। দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত মনের মিল। কিন্তু কথাবার্তায় দু'জন একেবারে দু'মেরুর বাসিন্দা, মাঝে মাঝেই তর্ক লেগে যায় ঘোর।

সেদিনও তর্ক লাগল দুই পণ্ডিতে। ডক্টর বাখুর্স্ট ধার্মিক মানুষ। তিনি বললেন, 'ঈশ্বরই আদম আর ইভকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন। বাদবাকি মানুষের সৃষ্টি ওই দু'জন থেকেই।'

ভদ্রলোকের আড়ষ্ট জিভে অবশ্য আদমকে এডেম আর ইভকে ইভা বলে মনে হলো।

বন্ধুর কুসংস্কার শুনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন ডক্টর মোরেনো।

রেগে বোম হয়ে গেলেন বাখুর্স্ট, গলা উঁচিয়ে বললেন, 'বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক না কেন, মহান শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য আজকের পৃথিবী দেখলে অবাক হয়ে যেত আদম, তাই বলে বেহেস্তের বাগানকে আমরা হার মানাতে পেরেছি পৃথিবীর সৌন্দর্য দিয়ে?'

সন্ধেটা তর্কাতর্কিতে না মাটি হয়ে যায়, আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলাম আমি। শুরু হলো বিজ্ঞানের প্রগতি নিয়ে মুখরোচক আড্ডা। মশগুল হয়ে গেলাম বিজ্ঞানের জয়জয়কার নিয়ে।

সৃষ্টির প্রথম যুগে মানুষ ভাবতেও পারেনি, এত উন্নতি করবে। চরম উন্নতি বোধহয় একেই বলে।

'কথাটা ঠিক নয়,' গম্ভীরভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট মেনডোজা। 'চরম উন্নতি এর আগেও ঘটেছিল। সব মিলিয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'যেমন?' এক সঙ্গে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম সবাই।

'ব্যাবিলন!'

তার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়লেন কয়েকজন। ব্যাবিলনের সভ্যতার সঙ্গে দু'হাজার সালের সভ্যতার তুলনা চলে নাকি?

কিন্তু প্রেসিডেন্টও নাছোড়বান্দা। বললেন, 'মিশরীয়রাও কম যায় না।'

আরও জোরে হেসে উঠলাম আমরা সবাই।

এবারে শেষ উদাহরণ দিলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'আটলান্টিয়ানদের কাহিনীকে কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দেয়া কিন্তু ভুল হবে। আটলান্টিস যেমন সভ্যতার শিখরে উঠে আটলান্টিকের তলায় সমাধিস্থ হয়েছে, কে জানে যুগ-যুগ ধরে এমনি আরও কত সভ্যতা চরম উন্নতি করেও মাটির তলে হারিয়ে গেছে কিনা! কেউ কারও খবর রাখে না। জানি না বলেই কি তাদের ইতিহাসকে উড়িয়ে দিতে হবে?'

'অসম্ভব!' বলে উঠলেন ডক্টর বাখুর্স্ট। 'আজকের সভ্যতার কথাই ধরুন না। গোটা পৃথিবীটা পানির তলায় তলিয়ে না গেলে এ সভ্যতা কখনও নিশ্চিহ্ন হবে না। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, সভ্যতার চিহ্ন থেকে যাবেই। অতীতেও যদি সেরকম কোন সভ্যতা থাকত, চিহ্ন রয়েই যেত।'

আর ঠিক তখুনি শুরু হয়ে গেল এক মহা প্রলয় সঙ্কেত। আচম্বিতে! আচমকা!

তিন

ডক্টর বাখুর্স্টের জবাব শুনে দমে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট মেনডোজা। কিন্তু হারবার পাত্র তিনি নন। তাই গম্ভীর গলায়

বললেন, 'গোটা পৃথিবীটাই যে একদিন পানির তলায় তলিয়ে যাবে না, এ কথা কিন্তু কেউ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারেন না। অসম্ভবও সম্ভব হয় অনেক সময়।'

আমরা যেই সমস্বরে 'বাজে কথা', বলে চেঁচিয়ে উঠেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল আওয়াজটা। থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের নিচে জমি। মাটি যেন ধসে যেতে চাইল নিচের দিকে। ভয়ানকভাবে টলমল করে উঠল গোটা ভিলাটা।

ঘাবড়ে গেলাম সবাই, অপ্রস্তুত হয়ে গেছি। উঠে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এ আবার কিসের প্রলয়। এমন সময় গোটা ভিলাটা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। এমনই কপাল, ভাঙা ভিলার ইঁট, কাঠ, পাথরের তলায় পিষ্ট হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট মেনডোজা আর আমার চাকর জামেন।

পরক্ষণেই শুনলাম চেঁচাচ্ছে র‍্যালে, এই ভিলার মালি সে, 'সাগর! পালাও! সাগর! পালাও! পালাও!'

ঘুরে দাঁড়ালাম। একি দৃশ্য! একি দেখছি! পৃথিবীর সবক'টা সাগর যেন উঠে আসছে আমার বাগানের দিকে। একশো গজ উঁচু পাহাড়টা তলিয়ে গেছে পানির নিচে। বিপুল জলোচ্ছ্বাস এগিয়ে আসছে এদিকে। বউ-বাচ্চা নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে র‍্যালে, আর চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে কণ্ঠে, 'পালাও! পালাও! সাগর!'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একি দৃশ্য দেখছি? চোখের সামনে দেখতে দেখতে চারদিকের সব দৃশ্য পাল্টে যাচ্ছে। প্রবল ভাবে ফুঁসে উঠে ধেয়ে আসছে সাগর।

কিন্তু সত্যিই কি সাগর এগোচ্ছে? ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। সাগর কিন্তু স্থির, নিস্তরঙ্গ। কিন্তু বাগানটা নেমে যাচ্ছে পানির তলে!

চকিতে বুঝলাম, কি সর্বনাশটা ঘটতে চলেছে পৃথিবীর বুকে।

ডাঙা নেমে যাচ্ছে পানির দিকে! এই জন্যই তখন কেঁপে উঠছিল পায়ের তলার মাটি। গোটা ভূখণ্ডটাই ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে অতলে। প্রতিটি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে তটরেখা।

পানি এগোচ্ছে দ্রুত। গতি কমপক্ষে ঘণ্টায় পাঁচ মাইল। বুঝলাম, তার মানে হাতে আর মাত্র তিন মিনিট সময় আছে। তার পরেই পানি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে আমাদের ওপর।

চোখের পলকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। হেঁকে উঠলাম জোর গলায়, 'গাড়ি বের করো। জলদি!'

মুহূর্তে বুঝে ফেলল সবাই আমার মতলব। তাড়াহুড়ো করে গ্যারেজ থেকে বের করে আনা হলো গাড়িটাকে। সবাই উঠে বসতেই ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে এগোল গাড়িটা। বাগানের গেট খুলে লাফ দিয়ে গাড়ির পেছন ধরে ঝুলতে লাগল র‍্যালে।

শুরু হলো মৃত্যুর সাথে পাল্লা। পানি চাইছে আমাদের গোগ্রাসে গিলতে, আর আমরা চাইছি নিজেদের বাঁচাতে। দ্রুত ছুটছে যন্ত্রদানব, তবু যেন যথেষ্ট নয়। মনে হচ্ছে আরেকটু দ্রুত ছুটলে বেঁচে যেতাম এযাত্রা।

তাকিয়ে দেখলাম, সাগরও ওঠে আসছে সমান গতিতে। আর মাত্র দশ-পনেরো হাত দূরে দেখা যাচ্ছে তার সর্বগ্রাসী ভয়ানক রূপ।

আচমকা রাস্তার ধারে একটা পাথরে লেগে থেমে গেল গাড়িটা। এঞ্জিনের শক্তিও বোধহয় ফুরিয়ে এসেছিল। একটানা এতটা খাড়া পথ ওঠা কম কথা নয়।

দেখতে দেখতে পানি পৌঁছে গেল পেছনে। পরক্ষণেই গ্রাস করল চাকার অর্ধেকটা অংশ। হায়, ঈশ্বর! কোন লাভই হলো না তাহলে?

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে

গেল গাড়িটা। কারণটা বুঝলাম একটু পরে, র‍্যালের স্ত্রীর আর্তনাদে।

পানির ধাক্কায় বেচারি র‍্যালে গাড়ি ছেড়ে খসে পড়েছে নিচে। হঠাৎ ওজন কমে যাওয়ায় ছুটতে শুরু করেছে গাড়ি।

ড্রাইভার সিমোনাট দক্ষ লোক। আরও একঘণ্টা এইভাবে ছুটলে ডুড়োয় পৌছুব আমরা।

কিন্তু তারপর?

ভাগ্য খারাপ। আচমকা ককিয়ে উঠে আবার থেমে গেল গাড়ি।

রাগে আর ভয়ে খিস্তি দিয়ে উঠল কয়েকজন।

'কি হলো, এঞ্জিন বিগড়েছে নাকি?' চেঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

নিরবে আঙুল তুলে সামনে ইঙ্গিত করল সিমোনাট। দেখলাম, দশগজ দূরে রাস্তা বলে আর কিছু নেই। যেন ছোরা দিয়ে নিখুঁত ভাবে কেটে নেয়া হয়েছে ওপাশের জমি।

নিঃসীম শূন্যতা!

পাহাড় ধসে গেছে!

পেছনে ধেয়ে আসছে পানি। মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপতে শুরু করলাম সবাই। জানি না কি লেখা আছে ভাগ্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবার কেঁপে উঠল মাটি। একই সঙ্গে থেমে গেল উন্মত্ত জলোচ্ছ্বাস। অবাক হয়ে দেখলাম, পানি আর উঠছে না। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে সাগর।

জানে পানি ফিরে এল সবার। বুঝতে পারলাম, সামনে খাদ আর পেছনে পানি, মাঝে আমরা কয়েকজন আতঙ্কিত মানুষ।

এভাবেই বেঁচে থাকতে হবে নাকি?

কি জানি!

চার

গভীর রাত। আচমকা ভীষণ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আমার। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সীমাহীন শূন্যতা থেকে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন সংঘর্ষ চলছে। ফেনা আর পানির সূক্ষ্ম কণা ভিজিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ।

তারপর আস্তে আস্তে সব থেমে গেল...নিবিড় নৈঃশব্দ চেপে বসল চারদিকে...ফর্সা হয়ে এল আকাশ...ভোর হলো...ভয়ঙ্কর একাকিত্বে ভরা বিষণ্ন ভোর!

পাঁচ

পঁচিশে মে।

ছোট্ট একটা দ্বীপে বন্দি আমরা। লম্বায় দেড় হাজার গজ আর চওড়ায় পাঁচশো গজ হবে দ্বীপটার আকৃতি। এক সময় উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিমে শুধু পাহাড় ছাড়া কিছু দেখা যেত না। এখন সেখানে থৈ-থৈ করছে পানি। পুব দিকের দৃশ্য আরও ভয়ঙ্কর। গতকালও সেখানে মেক্সিকো দেখেছি আমি। একরাতেই সেসব নিশ্চিহ্ন!

মেক্সিকো এখন পানির তলায়।

খিদে আর তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এখন বুকে জমল প্রবল হতাশা।

খাবার নেই, বিশুদ্ধ পানি নেই, বাঁচার কোন পথও নেই!
মরতেই হবে তাহলে?

ছয়

চার জুন। আমরা আছি 'ভার্জিনিয়া' জাহাজের ডেকে।

মেলবোর্ন থেকে 'ভার্জিনিয়া' জাহাজটা যাত্রা শুরু করে মাসখানেক আগে। চব্বিশে মে রাতে সাগরে হঠাৎ বড় বড় ঢেউ দেখতে পায় ক্যাপ্টেন, তার বেশি কিছু নয়।

মেক্সিকোর কাছে এসে ভার্জিনিয়া দেখে শুধু পানি আর পানি। মাঝে একটা ছোট্ট দ্বীপ। রোজারিয়ো নেই। মেক্সিকো নেই।

ছোট্ট সেই দ্বীপে পড়ে রয়েছে এগারোটি নিথর দেহ। দু'জন মৃত, ন'জন মৃতপ্রায়।

এই দশটা দিন কিভাবে কেটেছে ঈশ্বর জানেন। উইলিয়াম আর রোলিং মারা গেছে। বাকি ন'জন বেঁচে গেছি স্রেফ ভাগ্যের জোরে।

ক্যাপ্টেন আমাদের তুলে নিলেন ভার্জিনিয়ার ডেকে।

সাত

আজ আট মাস হলো পানিতে ভাসছি। সময়ের হিসাব জানি না।

মাসটা জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি, তা-ও সঠিক বলতে পারব না।

মাসের হিসাব রেখেই বা আর কি করব? যা আছে কপালে, তা-ই হবে।

ক্যাপ্টেন আমাদের জাহাজে তুলে বেরিয়েছিলেন মেক্সিকোর সন্ধানে। কিন্তু পুব দিকে অনেকটা গিয়েও মেক্সিকোর দেখা পাননি।

পানি ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

তারপরেও অব্যাহত থেকেছে যাত্রা। এক সময়ে জাহাজের কয়লা ফুরিয়ে গেল। চোদ্দই জুলাই পাল তুলে দিতে হলো আমাদের জাহাজের।

পাল তোলার পরপরই পড়লাম আমরা রাক্ষুসি ঝড়ের কবলে। একটানা পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা চলল জীবনমরণ টানাটানি। উনিশে আগস্ট আকাশে রোদ হাসতেই কম্পাস নিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন। দ্রাঘিমা আর লঘিমা বের করে যা বললেন, শুনে হতবাক হয়ে গেলাম আমরা।

আমরা যেখানে ভাসছি, এককালে সেখানে ছিল পিকিং!

তারমানে এশিয়ার অবস্থাও আমেরিকার মত হয়েছে? দুটি মহাদেশই তলিয়ে গেছে পানির তলায়?

আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোতেই নিরাশায় মনটা ভরে গেল। প্রমাণ পেলাম; তিব্বত নেই, হিমালয় নেই!

শুধু উত্তাল সাগরের অতল জলরাশি!

তবু ভেসে চললাম দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কিসের আশায় চলেছি আমরা জানি না। মহাদেশের পর মহাদেশের সকরুণ পরিণতি দেখেও আর চমকে উঠছি না। সব সয়ে গেছে। তাই উরাল পর্বতমালাকে নিশ্চিহ্ন দেখে বুঝলাম, আফ্রিকাও এখন পানির তলায়।

ক্রমেই ভীষণ সত্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু এখন আর ভয়ানক ধ্বংসের দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠি না। ক্যাপ্টেনের হিসেব শুনে বুঝতে পারি আমরা কোথায় আছি এখন। 'একসময়

এখানেই ছিল মস্কো...ওয়ার্শ...বার্লিন...ভিয়েনা...রোম...সেন্টলুই ...মাদ্রিদ!'

আশাহীনতার মাত্রা বেশি হলে মানুষ একসময় হতাশ হতেও ভুলে যায়।

মনে হয় এখন, গোটা ইউরোপটাই যদি তলিয়ে যায় তো আমার কী?

আসলে এভাবে বুকের ভার হালকা করা যায় না। সেদিন প্যারিসের ওপর এসে পৌঁছুল ভার্জিনিয়া। অনুভব করলাম, অনেক পানির গভীরে ডুবে রয়েছে আমার মাতৃভূমি। সিমোনাট কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

চারদিন পর দেখলাম এডিনবরাও নেই। নেই লন্ডনও।

এদিকে ফুরিয়ে গেল জাহাজের খাবারদাবার। ভাঁড়ার শূন্য। একটা বিস্কুট পর্যন্ত নেই।

শুরু হলো অনাহার। সাত মাস পর ফের অনুভব করলাম অনাহারের তীব্রতা কি ভয়ানক। জাহাজসুদ্ধ লোক নেতিয়ে পড়ল খিদের জ্বালায়। খুব সম্ভব আটই জানুয়ারি হঠাৎ ডাঙার মত কি যেন একটা চোখে পড়ল পশ্চিমে।

আমার ভাঙা গলায় চিৎকার শুনে লাফ দিয়ে উঠল মৃতপ্রায় যাত্রীরা, ছুটে এল ডেকে।

কিন্তু একি! একি দেখছি! অথই আটলান্টিকের মাঝে এখানে তো কোন দেশ ছিল না কখনও!

আরও কাছে গেলাম। নামেই ডাঙা, প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। গাছপালাও চোখে পড়ল না। রুক্ষ কালো পাহাড় মাথা তুলে আছে এদিক সেদিক। রুক্ষ, বিরান, অনুর্বর, নিঃস্ব, একাকী, ভয়াল। কেমন যেন ভয় লেগে উঠল আমাদের। মাটির পৃথিবী বলতে কি তাহলে শুধু এই বসবাসের অযোগ্য জায়গাটাই আছে।

খুঁজতে খুঁজতে উপকূলের ফাঁকে সরু পথ পেলাম অবশেষে।

ভেতরে ঢুকল জাহাজ। পানি সেখানে নিস্তরঙ্গ। প্রকৃতির তৈরি নিরাপদ একটি বন্দর যেন।

ডাঙায় নামার পর দেখলাম, ছোট ছোট হ্রদ রয়েছে বেশ কিছু। কিন্তু ওগুলোর পানি সুপেয় নয়, নোনতা।

জমিতে এককালে পুরু কাদা ছিল। এখন সেগুলো শুকিয়ে ফেটে ঝুরঝুর করে পড়ছে।

তারমানে এই জমি আগে আটলান্টিকের গভীরে ছিল। তাই জীবনের কোন চিহ্ন নেই ডাঙায়।

জলজ প্রাণী পেলাম অনেক। পাথরের খাঁজে খাঁজে অগুনতি কচ্ছপ আর শামুক আস্তানা গেড়েছে। চিংড়ি আর কাঁকড়ারও অভাব নেই। মাছ তো লাখে লাখে।

আর যাই হোক, না খেয়ে মরতে হবে না এখানে।

জাহাজের নোঙর পড়ল অবশেষে, দীর্ঘ আট মাস পর। সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে আনলাম ডাঙায়। শুরু হলো মুষ্টিমেয় ক'জন মানুষের নতুন করে বাঁচার যুদ্ধ।

জানি না, এতটুকু জায়গায় শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারব কিনা। তবুও লিখে রাখছি সব কথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে। কিন্তু আদৌ তারা আসবে কি?

আট

সয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

কতদিন হলো নেমেছি এই প্রাণহীন দেশে, তার হিসাব নেই। ডক্টর মোরেনো অবশ্য আন্দাজে বললেন, 'মাস ছয়েক তো বটেই।'

ছ'মাস!

কম সময় নয়। ছটা মাস কেটে গেল জন প্রাণহীন এই পাথুরে দেশে?

এই ছটা মাস ব্যস্ত থেকেছি কেবল পেটের চিন্তায়। উদয়াস্ত হন্যে হয়ে ঘুরি খাবারের সন্ধানে। রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি সীমাহীন ক্লান্তি নিয়ে। মাছ প্রচুর আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের ভয়ে লুকিয়ে থাকে। ধরা মুশকিল। কচ্ছপের ডিম আর সামুদ্রিক উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে আছি কোনমতে।

ভার্জিনিয়ার পালটা খুলে এনে একটা তাঁবু বানিয়েছি। পরে আরও ভাল ছাউনি তৈরি করব।

মাঝে মাঝে গুলি করে পাখি মেরে খাই। প্রথমে একটা পাখিও দেখা যায়নি। আস্তে আস্তে যাযাবর পাখিরাও উড়ে এলো আমাদের মত খিদের জ্বালায়। উইলো, অ্যালব্যাট্রস ইত্যাদি নানা রকম পাখি দিনরাত ডানা মেলে ঝটপটিয়ে ওড়ে আমাদের তাঁবুর চারপাশে। হাত দিয়েও ধরা যায়, গুলি খরচ করতে হয় না।

ভাগ্য আমাদের ভাল বলতে হবে। জাহাজের খোলে একবস্তা গম পাওয়া গেছে। সবাই চেয়েছিল, পুরো বস্তাটাই রুটি তৈরির জন্যে সরিয়ে রাখা হোক। আমরা ক'জন রাজি হইনি। বস্তার অর্ধেক গম দিয়ে গমের চাষ আরম্ভ করেছি। জানি না কপালে কি আছে। প্রথম দিকে মাটিতে নুন ছিল খুবই। কিন্তু তুমুল বৃষ্টির পর ওপরের নুন ধুয়ে গেছে। খানাখন্দে বৃষ্টির পানি জমে মিষ্টি পানির লেকও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নদীর পানি এখনও নোনতা। মাটির তলায় যে নুন রয়েছে, নদীতে মিশে যাচ্ছে সেই নুন ধীরে ধীরে।

দোঁআশলা মাটিতে বালি থাকলেও শেষ পর্যন্ত গম চাষ সার্থক হবে বলে মনে হয়। দেখি...

...দু'বছর হয়ে গেল। গমের ফলন ভালই হয়েছে। পাখির সংখ্যাও বেড়েছে। ওরা খেয়ে বাঁচছে।

নয়

ক'জন মারা গেছে, আগেই লিখেছি। কিন্তু আমাদের সংখ্যা কমেনি। বরং বেড়েছে। আমার ছেলে আর হেলেনের বাচ্চাকাচ্চাই তো তিনজন। আরও তিনটে সংসারেও বাচ্চার সংখ্যা ওরকম। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কচিকাঁচার মুখ দেখে ভাবি, সংখ্যায় কমে এসেছি বলেই কি মানুষজাতটার মধ্যে স্বাস্থ্য ফিরে এল?

...দশ বছর হয়ে গেল, অথচ নতুন মহাদেশের চেহারাও দেখা হয়নি। অলস হয়ে গেছি। অভিযানের ইচ্ছে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, খুঁচিয়ে জাগালেন বাখুর্স্ট। তাঁরই ঠেলায় জাহাজ মেরামত করা হলো। তারপর দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম আমরা দেশ পরিদর্শনে।

ভেতর দিকে ঢুকে আগ্নেয়গিরি দুটোকে দেখতে পাব ভেবেছিলাম। অ্যাজোরস আর ম্যাডিরা এককালে কম উৎপাত করেনি আটলান্টিকের নিচে। আগুন বমি করে লণ্ডভণ্ড করে ছেড়েছে আটলান্টিককে। এখন যখন পানির তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ভেবেছিলাম দেখতে পাব। কিন্তু দেখলাম কেবল জমাট লাভার স্তর।

আগ্নেয়গিরির চিহ্ন নেই, আছে শুধু আগ্নেয়শিলা। দেখলেই বোঝা যায়, আগুনেপাহাড় দারুণ দাপাদাপি করেছে সেখানে।

আশ্চর্য আবিষ্কারটা ঘটল এখানেই। অ্যাজোরস আগ্নেয়গিরি যে অক্ষাংশে থাকার কথা সেখানে পেলাম অনেক থাম, থালাবাসন এবং পাথরের মূর্তি। বেশ বুঝলাম, অতীতের লুপ্ত সভ্যতা। কিন্তু এ সভ্যতা আমাদের নয়, তারও আগের।

হারানো সেই আটলান্টিস!

হ্যাঁ, ডক্টর মোরেনো ঠিকই ধরেছেন। সুদূর অতীতের সেই আশ্চর্য মহাদেশ আটলান্টিস পানির তলায় নিমজ্জিত হয়েও ফের ঠেলে উঠেছে ওপরে। কি বিচিত্র লীলা ঈশ্বরের! একই ভূমিখণ্ডে বিভিন্ন মানুষ জাতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কি অদ্ভুত ইতিহাস!

আটলান্টিসের কিংবদন্তী তাহলে অলীক নয়? সংহার দেবতা এই দেশকে টেনে নিয়েছিল পানির তলায়। অ্যাজোরেসের অগ্নুৎপাতে ফের উঠে এসেছে পানি থেকে ওপরে?

কিন্তু অতীত নিয়ে খামোকা ভেবে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমরা এখন বাঁচতে চাই। বাঁচার তাগিদেই এগিয়ে চললাম। অবাক হলাম সবুজের চিহ্ন দেখে। আগে কিছুই ছিল না। খুব সম্ভব পাখিরা বীজ এনে ফেলেছে মাটিতে। সেই বীজই এখন গাছ হয়ে ছেয়ে ফেলছে ভূখণ্ড! প্রাণের বিস্তার যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না।

কিন্তু এসব গাছপালার চেহারাও তো কোনকালে দেখিনি। যে কোন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে নামগোত্রহীন এই উদ্ভিদগুলোর। এককালে হয়তো পানির তলায় ছিল। পানি থেকে ওঠার পর মরে গিয়েছিল রোদের তেজে। তারপর বৃষ্টির পানি জমেছে। সৃষ্টি হয়েছে পুকুর আর হ্রদের। অদ্ভুতভাবে নতুন নতুন জলজ উদ্ভিদ তরতাজা চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ডাঙায় উঠে এগোচ্ছে আরও ভেতরে। তারপর একেবারে পানির সংস্পর্শ এড়িয়ে গাছ হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনটা ঘটছে খুব দ্রুত। প্রথমেই ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছে কুঁড়ি, ফুটছে কচি পাতা। তারপরেই ভয় ঝেড়ে ফেলে মানিয়ে নিচ্ছে নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে।

শুধু এক্ষেত্রেই নয়। একই পরিবর্তন দেখছি প্রাণীদের ক্ষেত্রেও। মাছদের এখন ডানা গজিয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঙায় উড়ে আসছে উড়ন্ত মাছেরা। মাছ না বলে তাদের পাখি বলাই উচিত...

দশ

...সবাই আমরা 'আদি বাসিন্দারা' বুড়ো হয়ে গেছি।

ক্যাপ্টেন মরিস মারা গেল আজ। এখন দিন গুনছি আমরা বুড়োরা। আমি আটষট্টি। ডক্টর বাখুর্স্ট পঁয়ষট্টি। ডক্টর মোরেনো ষাট। মরবার আগে হাতের কাজ শেষ করতেই হবে, যেভাবেই হোক।

কিন্তু কি করব এতো লিখে? কে দেখবে? বংশধরেরা? হায়রে!

এ দৃশ্যও দেখতে হলো আমাদের! ছেলেমেয়ে তো পিলপিল করছে গোটা তল্লাটে। একে স্বাস্থ্যকর জায়গা, তার ওপর হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই, সুতরাং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু অভাবনীয়। বছর বছর জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে আমাদের কলোনির।

এই কলোনিতে শিক্ষিত মানুষ বলতে আমরা এই ক'জন। মানে, আমি আর আমার ছেলে, ডক্টর বাখুর্স্ট আর ডক্টর মোরেনো। কিন্তু আমরাও ঘুম থেকে উঠছি খিদে নিয়ে। সারাদিন ঘুরছি খিদের জ্বালা মেটাতে। দিনের শেষে বেদম ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছি অঘোরে। পেট ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই মগজে।

সভ্যতা নিয়ে গর্বিত মানুষ জাতটার মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছি আমরা মাত্র ক'জন। কিন্তু আমরাও আস্তে আস্তে পশু অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি। পশু থেকে নাকি মানুষের সৃষ্টি। এখন দেখছি ঠিক উল্টোটা ঘটছে! মস্তিষ্কের চর্চা আর নেই আমাদের। খালাসীদের কথা নাহয় না-ই বা বললাম। চিরকালই ওরা অশিক্ষিত, রুক্ষ,

পশুর মতো। বর্তমানে ওদের সেই পাশবিক সত্তা আরও বেড়েছে! আমরাও মাথা খাটাই না। মগজের মৃত্যু ঘটছে আস্তে আস্তে। ভয়াবহ খিদে নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে শুধু উদর। ডক্টর মোরেনো আর বুখার্স্টও মস্তিষ্ক শিকেয় তুলে রেখেছেন!

ভাগ্যিস বহু বছর আগে মহাদেশ দেখে এসেছিলাম। এখন সে সাহসও আর নেই। ভার্জিনিয়াও ভেঙে পড়েছে।

জাহাজ থেকে যে জামাকাপড় পরে নেমেছিলাম সেগুলো ছিঁড়ে যাবার পর সামুদ্রিক শৈবাল জুড়ে কাপড় বানিয়েছিলাম। এখন আর ভাল লাগে না। আমরা উলঙ্গ হয়েই ঘুরে বেড়াই নির্বিকারভাবে।

জরুরী কাজ বলতে শুধু একটাই। খাওয়া। খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ বুঝি না এখন। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদরকে শান্ত রাখা।

পেট সর্বস্ব হয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকেই। এরইমধ্যে পুরোনো স্নেহ-ভালবাসা এখনও টিমটিম করছে দু'জনের মধ্যে। আমার ছেলে জন এখন নাতিপুতি নিয়ে দাদু বনে গেছে। সে এখনও বাবা বলে মানে আমাকে। আর মানে আমার প্রাক্তন ড্রাইভার সিমোনাট।

সোজা কথায়, মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে আমাদের মধ্যে। এখনই যদি এই অবস্থা, এরপর যারা আসবে, তারা তো একেবারেই পশু হয়ে জন্মাবে। চোখের সামনে বাচ্চাকাচ্চাদের দেখছি বুনো হয়ে বেড়ে উঠছে। না জানে লিখতে, না জানে পড়তে। ভালমত কথাও বলতে পারে না। দাঁতগুলো চোখা চোখা। শুধু জানে খেতে। পশুর ঠিক আগের অবস্থা!

এরপর চিন্তাশক্তি আর স্মৃতি, সবই লোপ পাবে। কেউ জানবে না তাদের পূর্বপুরুষরা এই পৃথিবীর বুকেই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ দেখিয়ে গেছে।

সারাগায়ে ওদের বড় বড় লোম গজাবে। বাকশক্তি লোপ পাবে। মগজ কমে আসবে। বনজঙ্গলে লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়াবে খাদ্যের সন্ধানে।

কিন্তু আমরা, বুড়োরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে এই লিপি রেখে যেতে। মগজ স্থবির হবার আগেই লিখে রাখব মানুষের ইতিহাস, প্রগতির ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস। তাই এই প্রচেষ্টা। জাহাজ থেকে কাগজ, কলম আর কালি এনেছিলাম। তাই দিয়ে লিখে রাখলাম এই পাণ্ডুলিপি।

এগারো

পনেরো বছর পর ফের লিখতে বসেছি। ডক্টর মোরেনো মারা গেছেন। ডক্টর বুখার্স্টও নেই। একা আমি আগুয়ান মৃত্যুর প্রহর গুনছি। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আর বেশি দেরি নেই।

জাহাজ থেকে একটা লোহার সিন্দুক এনে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। মানুষ যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছে, তার প্রায় সবই লিখে সাজিয়ে রেখেছি তার মধ্যে। এই পাণ্ডুলিপিটা তার পাশেই পুঁতে রাখব একটা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে।

বিদায় হে মানুষ!

বিদায়!

বারো

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন আমাদের ইতিহাসবিদ।

মিস্ত্রিরা বাড়ির ভিত খুঁড়তে গিয়ে মাটি তোলপাড় করে ফেলেছে, কিন্তু লোহার সিন্দুক মেলেনি। তার মানে এত বছরে নিশ্চয়ই ওটা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, জং ধরে নষ্ট হয়ে গেছে লোহা। সেই সঙ্গে হারিয়ে গেছে সেই অমূল্য সম্পদ—মানুষজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা। নষ্ট হয়নি কেবল অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো, তাই টিকে গেছে এই পাণ্ডুলিপি।

থম মেরে রইলেন তিনি। তাঁর অনুমান তাহলে মিথ্যে নয়। পাথুরে স্তরের ফাঁকে ফাঁকে অতীত সভ্যতার নিদর্শন দেখে তিনি আঁচ করেছিলেন, অনেক বছর আগে এই থাম, অট্টালিকা, মূর্তি যারা তৈরি করেছিল, তারা মানুষ। অতি উন্নত সভ্যতার মানুষ।

পাণ্ডুলিপির মধ্যেই লেখা রয়েছে তাঁরা কারা। তাঁরা ডুবে যাওয়া আটলান্টিসের মানুষ।

আজ সেখানে জারগটদের সুবিশাল নগরী গড়ে উঠেছে, সুদূর অতীতে এখানেই জাহাজ থেকে নেমেছিলেন একটা ডুবে যাওয়া সভ্যতার অবশিষ্ট মানুষরা!

'হেদম' শব্দটা নিয়ে কত কথাই না শোনা গিয়েছিল জারগটদের মধ্যে। 'হেদম' তাদের ভাষা নয়।

নামটা তাহলে এলো কোত্থেকে এই নিয়ে জ্ঞানীদের মাঝে কত কথা কাটাকাটিই না হয়েছে!

এখন বোঝা গেল 'হেদম' নামের রহস্য। 'হেদম' এসেছে 'এদেম' থেকে। 'এদেম' এসেছে 'আদম' থেকে।

আদম! ডুবে যাওয়া সভ্যতার প্রথম মানব।

আদম!

এদেম!

হেদেম!

কল্পকল্পান্তরের এক একটা মানব জাতির প্রথম মানুষের নাম। কে জানে 'আদম' নামটাও ওই ভাবে এসেছে কিনা ঠিক তার আগের ডুবে যাওয়া সভ্যতা থেকে!

সে সভ্যতার মানুষটির প্রথম মানুষ ছিল বোধহয় 'উদম'। তারও আগে আরও একটা সভ্যতা যে একই ভাবে তলিয়ে যায়নি, তা কে বলতে পারে?

শিউরে উঠলেন জারগট। বেশ বুঝতে পারছেন, যুগযুগান্তর জুড়ে চলছে এই একই খেলা।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়!

মানুষ আসছে, সভ্যতার শীর্ষে উঠছে, তারপরই ধুয়ে মুছে হারিয়ে যাচ্ছে অতল সমুদ্রের বুকে।

এ খেলা চিরন্তন খেলা! শুরুর পরেই শেষ। শেষের পরেই শুরু।

এমন করেই কি একদিন জারগটদের 'চার সাগরের দেশ'ও তলিয়ে যাবে সাগরের অতল গভীর বুকে? আরেকটা ইতিহাস চাপা পড়বে পানির তলায়? জারগটদের তুলনায় পাণ্ডুলিপি লেখকদের সভ্যতা ছিল অত্যাধুনিক। তারা যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, জারগটরা হবে না কেন?

***

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সেবা প্রকাশনীর প্রকাশিত গত চার বছর আগের প্রায় সকল বই পাঠক-পাঠিকার জন্য ৪০% কমিশনে বিক্রি হচ্ছে। আজই যোগাযোগ করুন। এই সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য। অফিস চলাকালীন সময় সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।